একজন খ্রীষ্টানের
তিনটি প্রশ্নের উত্তর

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর প্রতিষ্ঠাতা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম 66:7)

একজন খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর

লেখক:

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)

প্রকাশনায়:
নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, ভারত

একজন খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
ভাষান্তর	ঃ	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ মুরব্বী সিলসিলাহ (অব.)
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	জুন, ২০২২ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

Title	:	Ekjon Khristaner teenti proshner uttar
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]
Translator	:	Maulana Ahmad Sadeq Mahmood; Murubbi Silsilah Bangladesh
Edition	:	June, 2022 (India)
Edited by	:	Bangla desk, India
Copies	:	500
Published by:		Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম রচিত "একজন খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর" পুস্তকটির বাংলা অনুবাদ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ মুরব্বী সিলসিলাহ (অব.) বাংলাদেশ করেছেন। পুস্তকটির অনুবাদ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ "মকতুবাতে আহমদ প্রথম খন্ড"-এর মধ্যে সংকলিত আকারে প্রকাশিত হয়।

নব আঙ্গিকে পুস্তকটির কম্পোজিং করে সহযোগিতা করেছেন বুশরা হামীদ সাহেবা। রিভিউ করেছেন জনাব শেখ মোহাম্মদ আলী, সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ এবং জনাব রফিকুল ইসলাম (এম. এ) মুরুব্বী সিলসিলাহ্। প্রুফ দেখে দিয়েছেন জনাব মোহাম্মদ সাবির মোল্লা মুরুব্বী সিলসিলাহ্ এবং সাজিদা খাতুন সাহেবা। পুস্তকটির সম্পাদনা করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

পুস্তকটির প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

জুন ২০২২
কাদিয়ান

হাফিয মখদুম শরীফ
নাযির, নশর ও এশায়াত

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ; ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ; ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে

নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে,তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচয়

একজন খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর

১৮৮৯ সালের মে অথবা জুন তদনুযায়ী ১৩০৯ হিজরীতে জনৈক এক খ্রীষ্টান আবদুল্লাহ জেমস নামী আঞ্জুমান হিমায়ত-এ-ইসলাম লাহোরে ইসলাম সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্ন প্রেরণ করে উত্তর কামনা করে। উক্ত আঞ্জুমান উত্তরের উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম, হযরত হেকীম মওলানা নূর উদ্দীন সাহেব (রাযি.) এবং মৌলবী গুলাম নবী সাহেব অমৃতসরীকে প্রেরণ করে।

আঞ্জুমান হিমায়ত-এ-ইসলাম লাহোর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর "একজন খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর" শিরোনামে তা প্রকাশ করে দেয়। হযরত আকদস মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম প্রদত্ত উত্তরগুলি পরবর্তীতে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী 'মকতুবাতে আহমদ' তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৪- ৭৯ এর মধ্যে প্রকাশ করেন - যা 'তাসদিকুন্নবী' নামেও পৃথক ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।

ইতিপূর্বে নিবন্ধটি 'রূহানী খাযায়েন'- এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) - এর সদয় অনুমোদনে এখন এটা বর্তমান সংস্করণে শামিল করা হ'ল।

প্রকাশক

সৈয়্যদ আব্দুল হাই

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম শেষ যুগে ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে উম্মতের মধ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। সেইসাথে মসীহ মাওউদ-এর একটি মৌলিক কাজ,

فيكسر الصليب ويقتل الخنزير

(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া, অধ্যায়- নযুল ঈসা ইবনে মরিয়ম)

অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর হত্যা করবেন- বলেও বর্ণনা করেছিলেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে মসীহ্ মাওউদ খ্রিষ্টধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলিকে খন্ডন করবেন এবং পরিবর্তে ইসলামের প্রকৃত বিশ্বাসগুলিকে বিজয়ী করে তুলবেন। সেইসাথে শূকর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগন থেকে তাদের সকল প্রকারের অপবিত্রতা ও কলুষতা দূর করে তাদেরকে পূতপবিত্র করে তুলবেন। এই হাদীসে একদিকে যেখানে মসীহ মাওউদ-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে একটি স্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে যে, শেষ যুগে খ্রিষ্টধর্ম প্রভূত উন্নতি সাধন করবে এমনকি তারা সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবে।

সেই সময় প্রত্যেক মুসলমান যাদের হৃদয়ে ইসলামের বেদনা ছিল তারা মুসলমানদের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এশিয়া উপমহাদেশে আর্য ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজক এবং তাদের প্রচারকরা ইসলামের উপর অত্যন্ত আক্রমণাত্মকভাবে আগ্রাসন শুরু করে দিয়েছিল। তাদের আক্রমণ এতটাই তীব্রতর হয়ে উঠেছিল যে সে সময় মুসলমান উলামারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের কাছে সেসব আক্রমণের কোনও প্রত্যুত্তর ছিল না। বহু মুসলমান তাদের নিরুত্তর ভাব প্রত্যক্ষ করে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রীষ্ট ধর্মের

আঁচলে আশ্রয় নেয়। কেউ কেউ আবার সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়া শুরু করে। সে সময় খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের শাণিত আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে একজনই আল্লাহর যোদ্ধা ছিলেন অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস সালাম। তিনি একাই এহেন ধর্মগুলির সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে গেছেন।

আঞ্জুমান হিমায়ত-এ-ইসলাম - এর পক্ষ থেকে জনৈক খ্রিষ্টান আবদুল্লাহ জেমস ইসলাম সম্পর্কিত তিনটি প্রশ্ন উত্তরের জন্য লিখেছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম ও হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেবের কাছেও এই প্রশ্ন পাঠান। এর উত্তরগুলি আঞ্জুমান হিমায়ত-এ-ইসলাম দ্বারা ১৩০৯ হিজরীতে "একজন খ্রিষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। (পরবর্তিতে এই পুস্তকটি কাদিয়ান থেকে 'তাসদিকুন্নবী' শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। যার মধ্যে শুধু হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল।)

আঞ্জুমান হিমায়ত-এ-ইসলাম এর মুখপত্রে লেখে - "ইসলামের সেই আন্তরিক অনুসারীরা, যারা তাদের উচ্চ মাত্রার ধর্মীয়তা, যোগ্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তম আচরণ ইত্যাদির কারণে 'জ্ঞানের রত্নভান্ডার' বলে দাবি করা জাতিগুলির প্রভু ছিলেন- তাদের প্রজন্মগুলি আজ নির্বোধ, অদক্ষ এবং আপন সত্য ধর্মের পবিত্র নীতিগুলি অনুসরণ করা থেকে যোজন দূরে অবস্থান করছে। তাদের মূর্খতার পরিণাম এই যে, পৌত্তলিক জাতি, যাদের আপন ধর্মের সত্যতার সপক্ষে কোন যৌক্তিক এবং অনুকরণমূলক প্রমাণ নেই- তারা প্রকাশ্যে ইসলাম বিরোধিতার পক্ষে দন্ডায়মান এবং আমাদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতা দিয়ে তাদের জবাব দেওয়ার সাহস আমাদের নেই।"

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিশদভাবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তাঁর (আ.)-এর কিছু উক্তি উদাহরণ হিসেবে তুলে করা হলো-

"এখন হে সত্যান্বেষী ও সত্য নিদর্শনাবলীর জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিরা! ন্যায়বিচারের চোখ দিয়ে দেখ এবং একটু পবিত্র চিত্তে চিন্তা কর, আল্লাহ্

কর্তৃক কুরআন মজীদে বর্ণিত নিদর্শনাবলী যে কত উচ্চ পর্যায়ের ও কত উঁচু মানের এবং এগুলো প্রত্যেক যুগের জন্যই কত দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতুল্য। আগের নবীদের মু'জিযা সমূহের এখন আর চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। সেগুলো কেবল কেসসা কাহিনী মাত্র। সেগুলোর মৌলিকতা কতটুক সঠিক তা খোদা তাআলাই ভাল জানেন। বিশেষত ইঞ্জিলে লেখা হযরত মসীহর মু'জিযাসমূহ গল্প- কাহিনীরূপে অতিরঞ্জিত হওয়ার পাশাপাশি এমন সব সন্দেহ সংশয়ের লক্ষ্যস্থল, যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এগুলোকে দেখানো বড়ই কষ্টকর।"

"মোটকথা, আমেরিকা ও ইউরোপ আজকাল এক অস্থির অবস্থায় রয়েছে। সত্যের বিরোধী বিশ্বাসগুলো তাদের দারুণ অস্থিরতার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। অবশেষে তাদের কেউ কেউ এ ধারণাও প্রকাশ করেছে যে মসীহ বা ঈসা নামে আসলে কখনো কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করেন নি। বরং এতে সূর্যকে বোঝায় এবং বারজন হাওয়ারী বলতে আকাশের বারটি 'বুরূজ' (কক্ষপথ) বোঝায়। অতঃপর এই খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিশেষত এ বিষয়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে হযরত মসীহ্ ঈমানদারদের জন্য যেসব চিহ্ন নির্ধারণ করে ছিলেন সেগুলোর একটিও এ লোকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মসীহ্ বলেছিলেন, তোমরা আমার অনুবর্তিতা করলে প্রত্যেক প্রকার আশিস ও বরকত এবং ঐশীগ্রহণযোগ্যতায় আমারই রূপ ধারণ করে ফেলবে। আর মু'জিযা ও কবুলিয়তের নিদর্শনাবলী তোমাদের দান করা হবে। আর তোমাদের মু'মিন হবার এটাই চিহ্ন হবে যে তোমরা নানা ধরনের ঐশী নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হবে। তোমরা যা চাইবে তোমাদের জন্য তা-ই ঘটবে এবং কোন বিষয়ই তোমাদের জন্য অসম্ভব হবে না। কিন্তু খ্রিষ্টানদের হাতে এসব আশিসের কিছুই নেই। তারা সেই খোদা সম্পর্কে নিছক অজ্ঞ যিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দোয়া শোনেন, স্নেহ ও রহমতপূর্ণ উত্তর সরাসরি তাদের দান করেন ও অদ্ভূত অদ্ভূত কাজ তাদের স্বপক্ষে সাধিত করে দেখান।"

এখন জানা উচিত, খোদার প্রিয়, গৃহীত ও মনোনীত এবং সত্যিকার বন্ধু হওয়ার মর্যাদা যার চিহ্নাবলী সংক্ষিপ্তাকারে আমি বর্ণনা করে এসেছি এ মর্যাদা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুবর্তিতা ছাড়া কখনো অর্জিত হতে পারে না। তাঁর খাঁটি অনুসারীর মোকাবেলায় যদি কোন খ্রিষ্টান আর্য বা

ইহুদী ঐশী গ্রহণযোগ্যতার জ্যোতি ও চিহ্নাবলী দেখাতে চায় তাহলে তার পক্ষে এমনটি করা কখনো সম্ভব হবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট পন্থা এই যে, একজন খাঁটি মুসলমান যিনি সত্যিকারভাবে নবী (সা.)-এর অনুবর্তিতাকারী এমন প্রকৃত মুসলমানের মোকাবেলায় অন্য কোন ব্যক্তি যেমন খ্রিষ্টান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা করে, 'তোমার স্বপক্ষে যে পরিমাণ ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে অথবা যে পরিমাণ গোপন রহস্যের বিষয় তোমার কাছে উন্মোচিত হবে,অথবা দোয়া কবুলের মাধ্যমে তোমাকে যা যা সাহায্য দান করা হবে, অথবা তোমার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য যেভাবে ঐশী ক্ষমতার কোন দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হবে, অথবা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে তোমাকে যেসব বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার প্রতিশ্রুতি দান করা হবে অথবা তোমার কোন ক্ষতিসাধনকারী ঘোর বিরোধীর সম্পর্কে যে কোন সতর্কীকরণমূলক সংবাদ দান করা হবে উল্লেখিত সব বিষয়ে যা কিছু তোমার পক্ষ থেকে বাস্তবে প্রকাশিত হবে এবং এতদসম্পর্কীয় যা কিছু তুমি দেখাবে তা আমিও দেখাবো' তাহলে (নিশ্চিত জানবেন) কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেই এরূপ প্রতিদ্বন্দিতা করা কখনো সম্ভব হবে না এবং তারা কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে না। কেননা তাদের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা মিথ্যেবাদী। সেই প্রকৃত ও সত্য খোদার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই যিনি সত্যপরায়ণদের সাহায্যকারী এবং সিদ্দীকগণের বিশ্বস্ত বন্ধু রয়েছেন যেমন পূর্বেও আমি এ সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করে এসেছি।

وَهٰذَا اٰخِرُ كَلَامِنَا وَالْحَمْدُلِلّٰهِ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا وَّ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا۔
هُوَمَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْوَكِيْل"

নাযির এশায়াত

Title Page of the First Edition

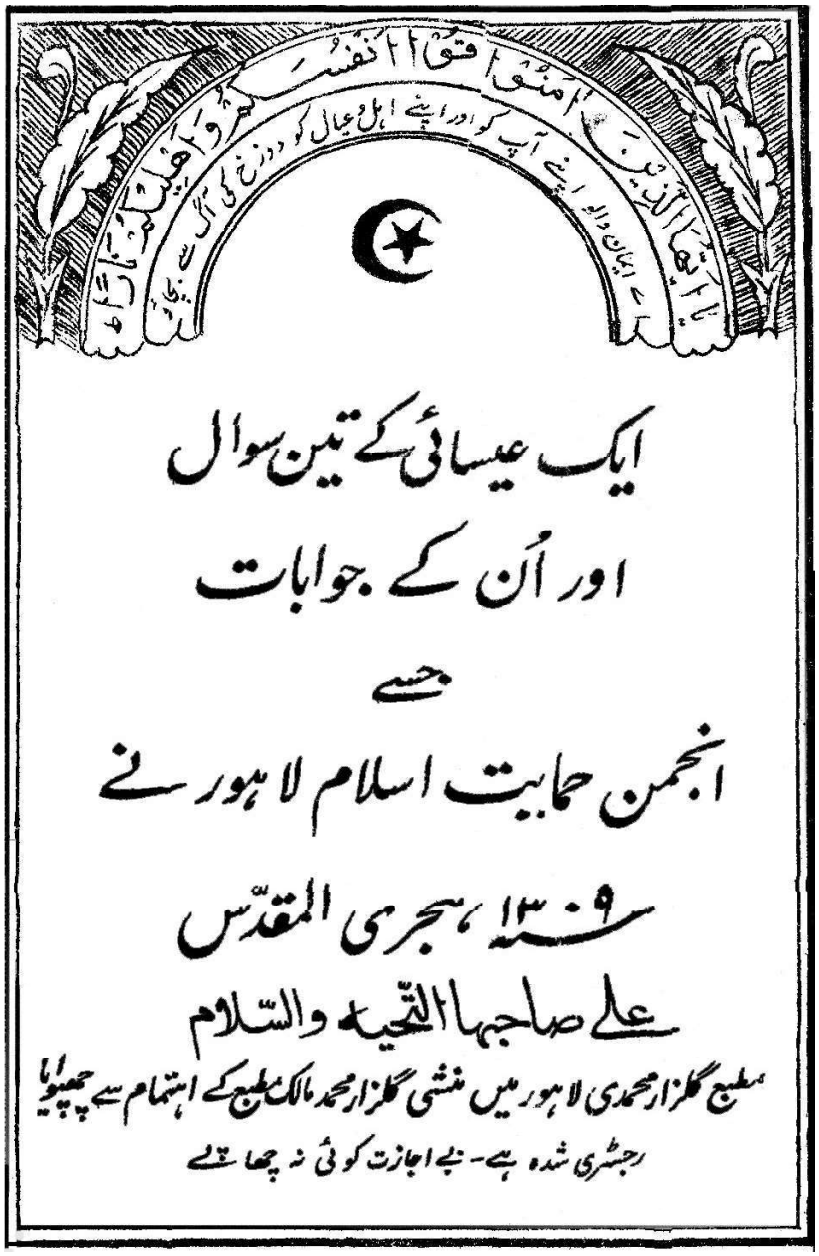

ایک عیسائی کے تین سوال

اور اُن کے جوابات

جسے

انجمن حمایت اسلام لاہور نے

سنہ ۱۳۰۹ ہجری المقدّس

علی صاحبہا التحیہ والسّلام

مطبع گلزار محمدی لاہور میں منشی گلزار محمد مالک مطبع کے اہتمام سے چھپوایا

رجسٹری شدہ ہے۔ بے اجازت کوئی نہ چھاپے

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯২

একজন খ্রিষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তর

একজন খ্রিষ্টান ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন 'আঞ্জুমান হিমায়াত-এ-ইসলাম, লাহোর'-এর মাধ্যমে করেছিলেন। আঞ্জুমান সে প্রশ্নগুলো হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম ও হযরত মওলানা হাকীম নূরুদ্দীনের কাছে পাঠায়। প্রভু ও দাস সেসব প্রশ্নের উত্তর লিখে আঞ্জুমানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যেহেতু একজন খ্রিষ্টানের চিঠির উত্তর একটি খোলা চিঠির মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল কাজেই সেসব প্রশ্নসহ উত্তর প্রকাশ করা গেল। ওয়া বিল্লাহিত তাওফীক (-সম্পাদক, সাপ্তাহিক 'আল্-হাকাম')।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم

بَلۡ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىۡ صُدُوۡرِ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ ؕ

(অর্থ- "আসলে যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে এ (কুরআন) তো তাদের অন্তরে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে অঙ্কিত রয়েছে।" সূরা আনকাবূত 29 : 50)

কয়েক দিন হলো, আব্দুল্লাহ্ জেমস্ নামী একজন খ্রিষ্টান ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আঞ্জুমানকে উত্তর দানের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অতএব সেগুলোর উত্তর এ আঞ্জুমানের তিনজন সম্মানিত সুযোগ্য প্রভাবশালী ও সাহায্যকারী সদস্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা যথাযথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

প্রথম প্রশ্ন : নিজের নবুওয়ত এবং কুরআন মজীদের আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) হওয়ার বিষয়ে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সন্দিহান হওয়া যেমন সূরা বাকারা এবং সূরা আনআমে লিপিবদ্ধ আছে:

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ع (অর্থ-তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না-অনুবাদক। সূরা বাকারা 2 : 148; সূরা আল্ আন্'আম 6 :115)। এতে প্রমাণিত হয় যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ অন্তরে নিশ্চিত জানতেন, তিনি খোদার পয়গম্বর নন। তিনি যদি খোদার পয়গম্বর হতেন অথবা তিনি কখনও কোন মু'জিযা দেখাতেন কিম্বা (তাঁর) মে'রাজ হতো অথবা জিবরাঈল (আ.) কুরআন মজীদ আনতেন, তাহলে তিনি তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে কখনও সন্দিহান হতেন না। এতে কুরআনকে অস্বীকার করা এবং তাঁর নবুওয়তে সন্দিহান হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল নন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মুহাম্মদ (সা.) কখনো কোন নিদর্শন লাভ করেননি। যেমন সূরা আনকাবূতে উল্লেখিত রয়েছে : 'আর তারা বলে, কেন তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার প্রতি নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ হলো না? অর্থাৎ কোন একটিও না', (কেননা এ আয়াতে 'লা নাফিয়া জিনস' রয়েছে যা কোন একটি শ্রেণীর সবটাকেই অস্বীকার করে)। আর সূরা বনী ইস্রাঈলেও রয়েছে : 'পূর্ববর্তীরা নিদর্শন অস্বীকার করেছে বিধায় তা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছি'। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, খোদা কোন মু'জিযা দান করেননি। প্রকৃতপক্ষে কোন মু'জিযা লাভ করে থাকলে তারা (অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকরা) নবুওয়ত ও কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হতো না।

তৃতীয় প্রশ্ন : মুহাম্মদ (সা.) যদি পয়গম্বর হতেন তাহলে সে সময়কার (লোকদের) প্রশ্নের মুখে অসহায় হয়ে উত্তরে এ কথা বলতেন না, 'খোদা জানেন' অর্থাৎ তাঁর জানা নেই। আর 'আসহাবে-কাহ্‌ফ' অর্থাৎ গুহাবাসীদের সংখ্যা বর্ণনায় তিনি ভুল করতেন না। তা ছাড়া এ কথাও বলতেন না, সূর্য কর্দমাক্ত উৎসে লুকোয় বা ডোবে। অথচ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে নয় কোটি গুণ বড়। এটি কী করে কাদায় লুকোতে পারে?

নোট : হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবদুল্লাহ্ জেমস্-এর তৃতীয় প্রশ্নটিকে (সম্ভবত এর গুরুত্বকে বিবেচনা করে) দ্বিতীয় প্রশ্ন সাব্যস্ত করে এর উত্তর প্রদান করেছেন। এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সবশেষে রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল রাযিআল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ্ জেমস্‌ের প্রশ্নের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। প্রকাশক-কাদিয়ান

ঐশী আশীর্বাদধন্য এবং কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপক কাদিয়ানের সম্মানিত রইস মির্যা গুলাম আহমদ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর

প্রথম প্রশ্নের উত্তর :

আপত্তিকারী প্রথমে তার দাবীর স্বপক্ষে সূরা বাকারাহ্ থেকে যে আয়াতের অংশবিশেষ পেশ করেছেন, পূর্ণাকারে সে আয়াতটি হলো:

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۔

(অর্থ 'এটাই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে, অতএব তুমি কখনও সন্দিহান হবে না।'-অনুবাদক, সূরা বাকারা 2 : 148)। এ আয়াতটির পূর্বাপর অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, এখানে নবুওয়ত ও কুরআন করীমের কোন উল্লেখ নেই। কেবল এ বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে যে এখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নয় বরং বায়তুল্লাহ্ কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া উচিত। অতএব আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এ আয়াতটিতে বলেছেন, এটাই সত্য বিষয় অর্থাৎ খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়া (প্রকৃত) সত্য, যা সূচনা থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এর বর্ণনা রয়েছে। অতএব তুমি (হে এ কিতাবের পাঠক!) এ বিষয়ে সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।✡ অতঃপর এ আয়াতের পরেও একই বিষয় সম্পর্কে আয়াতগুলো রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ

অর্থাৎ 'যে দিক থেকেই তুমি বের হও তুমি খানা-কা'বার দিকেই নামায পড়। এটাই তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে সমাগত সত্য।' (আল্ বাকারা 2 : 150)

মোট কথা, এটা সুস্পষ্ট যে এসবগুলো আয়াত কেবল খানা কা'বারই সম্পর্কে।

✡- এখানে এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং ইঞ্জিলেও কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ইঙ্গিতদান করা হয়েছে। দেখুন যোহন 4 : 21-24 : 'যীশু তাকে বললো, হে মহিলা আমার কথায় বিশ্বাস রাখ, সে মুহূর্ত আসন্ন যখন তুমি এ পাহাড়টিতে এবং জিরোশালিমেও পিতার উপাসনা করবে না।'- গ্রন্থকার

অন্য কোন কিছুর প্রসঙ্গে নয়। আর খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্য যে এ আদেশটি দেয়া হয়েছে এটি যেহেতু এক সাধারণ আদেশ, সকল মুসলমানই এ আদেশের আওতাভুক্ত। কাজেই এ সর্বব্যাপক আদেশের কারণে কোন কোন সন্দেহ-সংশয়প্রবণ লোকের সন্দেহ দূর করার জন্য এ আয়াতগুলোতে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তারা যেন এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার না হয় যে পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পড়তে এখন সহসা সে দিক থেকে সরে কেন খানা-কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে শুরু করা হলো? কাজেই আল্লাহ্ বলেন, এ কোন নতুন বিষয় নয়, বরং এটি হচ্ছে সেই সুনির্ধারিত বিষয়। এ সম্পর্কে খোদা তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন। অতএব এতে সন্দেহ পোষণ করো না।

আপত্তিকারী নিজ দাবীর সমর্থনে যে দ্বিতীয় আয়াতটি লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি সূরা আনআমের একটি আয়াত। যা এর সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ সহকারে এভাবে রয়েছে:

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

(সূরা আন্'আম 6 : 115)

অর্থাৎ "আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হাকাম (-ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী) অন্বেষণ করবো? অথচ তিনিই সুবিন্যস্ত কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যাদেরকে আমরা কিতাব তথা কুরআন দান করেছি অর্থাৎ যাদেরকে কুরআনের (প্রকৃত) জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিয়েছি তারা ভালভাবে জানে, এটি আল্লাহ্র পক্ষ হতে (অবতীর্ন)। অতএব হে পাঠক! তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"(সূরা আন্'আম 6 : 115)। এখন এ আয়াত সমূহে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার জানা যায় যে "ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন (-অতএব সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না')-এ আয়াতে সম্বোধিত ও লক্ষীভূত হচ্ছে সেই সব লোক, যারা এখনও দৃঢ়বিশ্বাস, ঈমান ও প্রকৃত জ্ঞানের সামান্যটুকুই আয়ত্ত করেছে। বরং উপরের আয়াতগুলো থেকে এ-ও প্রতিভাত হয় যে, এ স্থানে 'ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন' সম্বলিত নির্দেশটি

খোদার পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উক্তি যা কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা আয়াতের সূচনায় উক্ত আয়াতাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে বাক্যটি রয়েছে অর্থাৎ 'আ-ফা গাইরাল্লাহি আবতাগি হাকামান' (–আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন 'হাকাম' চাইতে পারি–অনুবাদক) এটি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই বাক্য বা উক্তি। অতএব সমগ্র এ আয়াতগুলোর প্রাঞ্জল অনুবাদ হচ্ছে : "আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন 'হাকাম' নির্ধারণ করতে পারি না। যিনি আমার এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। সে যে তিনিই যিনি তোমাদের প্রতি সুবিন্যস্ত কিতাব নাযিল করেছেন। অতএব যাদেরকে এই কিতাবের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা আল্লাহ্র পক্ষ হতে এর সমাগত হওয়ার বিষয়ে ভালভাবে জানে। অতএব (হে জ্ঞানহীন ব্যক্তি!) তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

এখন গবেষণায় প্রতীয়মান হলো যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজে সন্দেহ পোষণ করেন না। বরং তিনি সন্দেহ পোষণকারীদেরকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ওরূপ করতে নিষেধ করেন। অতএব এরূপ সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নিজ রিসালত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কথা আরোপ করা নিছক অজ্ঞতা ও জ্ঞানশূন্যতা অথবা শুধু শুধু বিদ্বেষ ও আক্রোশ নয় তো অন্য কী-ই বা হতে পারে?!

অতঃপর কারও মনে যদি এ ধারণার উদ্রেক হয় যে সন্দেহ পোষণ করা থেকে দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিম বা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বারণ করা হয়ে থাকলে তাদেরকে তো 'তুমি' না বলে 'তোমরা সন্দিহান হয়ো না' বলা উচিত ছিল। কারণ দুর্বল ঈমানের মানুষ কেবল একজন নয়, বরং অনেক হয়ে থাকে। কাজেই বহু বচনের পরিবর্তে প্রথম পুরুষ এক বচনে সর্বনাম কেন ব্যবহার করা হলো? এর উত্তর হলো, এই এক বচন দ্বারা শ্রেণীমূলক এক বচন বোঝায়, যা জামাত (দল) অর্থ বহন করে থাকে। আপনারা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন পড়েন তাহলে বেশির ভাগ স্থলে জামাত বা দলকে একজন ব্যক্তি হিসেবে সম্বোধন করার সাধারণভাবে প্রচলিত এ বাগধারাটি দেখতে পাবেন। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ এ আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন:

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝
وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا
قَوْلًا كَرِيْمًا ۝
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ
صَغِيْرًا ؕ ۝ (সূরা বনী ইস্‌রাঈল 17 : 23-25)

অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করবে না। যদি তুমি তেমনটি কর তাহলে তুমি লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে। আর আমার খোদা এটাই চেয়েছেন, তোমরা যেন তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য না হোক। আর তুমি মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার সামনে (তথা জীবদ্দশায়) তারা উভয়ে বা তাদের একজন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তুমি তাদেরকে 'উহ্'-ও বলো না। এবং তাদেরকে বকা-ঝকা করবে না; বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র ও সম্মানসূচক কথা বলবে। আর তুমি মমতা ভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। এবং দোয়া কর, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিল।' (সূরা বনী ইস্‌রাঈল 17 : 23-25)

এখন লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্ট এ পথ নির্দেশনা রয়েছে যে এ এক বচনের সম্বোধনটি সমগ্র উম্মতের জন্য রয়েছে। এদেরকেই এ আয়াতগুলোতে অনেক বার 'তুমি' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। বস্তুত আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ আয়াতগুলোতে সম্বোধিত নন। কারণ এ আয়াতগুলোতে মাতাপিতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ রয়েছে। আর এ তো স্পষ্ট (সুবিদিত) যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাতাপিতা তাঁর শৈশবকালে বরং মাতৃদুগ্ধপানকালীন সময়েই মারা গিয়েছিলেন। অতএব এ (আয়াত) থেকে এবং অন্যান্য আরও আয়াত থেকেও সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, জামা'ত বা সমষ্টিকে এক বচনে সম্বোধন করা কুরআন করীমের একটি সাধারণ ভাবে

প্রচলিত বাগধারা। এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রমাণিত হয়ে চলে যায়। এ বাগধারাটি তওরাতের আদেশগুলোতেও দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ এক বচন সম্বোধনসূচক শব্দের মাধ্যমে আদেশ দান করা হয় এবং এ দিয়ে বনী ইসরাঈলের জামাত বা সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন, যাত্রা পুস্তক ৩৩, ৩৪ অধ্যায়ে বাহ্যত হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : (১১) আজকের দিনে তোমাকে যে আদেশ দান করছি তা তুমি স্মরণ রেখো। (১২) তুমি সাবধান থেকো, যে দেশে (তথা ফিলিস্তিনে) তুমি যাচ্ছো সেখানকার অধিবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ো না। (১৭) তুমি ভেঙ্গে ফেলা উপাস্যগুলোকে নিজের জন্য (আবার) গড়ো না।

এখন এ শ্লোকগুলোর পূর্বাপর লক্ষ্য করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এ শ্লোকগুলোতে যদিও হযরত মূসাকে সম্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে এ আদেশগুলো দেয়া হয় নাই। হযরত মূসা (আ.) তো কিনানেও (ফিলিস্তিনে) যান নাই এবং প্রতিমা পূজার ন্যায় খারাপ কাজ মূসা (আ.)-এর মত প্রতিমাভঙ্গকারী ঐশীপুরুষ কর্তৃক কী করেই বা সংঘটিত হতে পারতো, যে কাজটি থেকে তাকে বারণ করা হয়েছিল? কেননা মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র সেই নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'তুমি আমার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং আমি তোমাকে তোমার নামেই চিনি। (দেখুন যাত্রা পুস্তক,অধ্যায়: ৩৩, শ্লোক : ১৭)।

অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এ পদ্ধতিটিই কুরআন করীমেরও। তওরাত ও কুরআন করীমে অধিকাংশ আদেশ এ আকারেই রয়েছে। বাহ্যত হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে সম্বোধন করে সে আদেশগুলো দেয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো উম্মত ও জাতিকে লক্ষ্য করে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু যারা এ গ্রন্থদ্বয়ের উক্ত বাগধারা সম্বন্ধে অবহিত নয় তারা অজ্ঞতাবশত এটাই মনে করে যে সে কথাগুলো নবীকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টি এবং তৎনিহিত ইঙ্গিতসমূহের মাধ্যমে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে তাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তদুপরি যেসব আয়াতে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ণাঙ্গীন দৃঢ়বিশ্বাসের প্রশংসা করেছেন, সেসব আয়াতে দৃষ্টি দিলেও উক্ত আপত্তিটির সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন

হয়। যেমন এক জায়গায় বলেন, قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ অর্থাৎ তুমি বল, আমি আমার রিসালতের পক্ষে প্রকাশ্য প্রমাণ আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছি।' (আল আনআম 6 : 58)। আবার অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ هٰذِهٖ سَبِیْلِیْٓ اَدْعُوْٓا اِلَی اللّٰهِ ۣ عَلٰی بَصِیْرَةٍ

অর্থাৎ তুমি বল, এ হলো আমার পথ। আমি সন্দেহাতীত জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি।' (সূরা ইউসুফ 12 : 109) আরও এক আয়াতে বলেন,

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا (আন নিসা 4 : 114)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং হিকমত' তথা কিতাব ও রিসালতের সত্যতার যুক্তি প্রমাণ তোমার ওপর প্রকাশ করেছেন এবং তোমাকে সেই সব জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি নিজে নিজে জানতে পারতে না। বস্তুত তোমার প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র এক অতি মহান অনুগ্রহ।' (আন নিসা 4 : 114) এরপর সূরা নাজ্মে আল্লাহ্ বলেন:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی ○

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی ○ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی ○

(আন্ নাজম 53 : 12, 18-19)

অর্থাৎ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয় তাঁর সত্যতার যে সব স্বর্গীয় নিদর্শন অবলোকন করেছিল তার কোন অংশেও অস্বীকার করেনি। অর্থাৎ সন্দিহান হয়নি অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি সত্যের ওপর নিবদ্ধ হয়ে গেল। আর নিশ্চয় সে তার প্রভু-প্রতিপালকের সুমহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিল।' (আন্ নাজম 53 : 12, 18-19)।

এখন হে পাঠকবৃন্দ! একটু ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখুন, হে সত্যের প্রেমিকগণ! সত্যপরায়ণতার মাধ্যমে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তাআলা কত পরিষ্কার ভাষায় সুসংবাদ দান করেন যে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ নবুওয়তে সুদৃঢ় বিশ্বাস

রাখতেন এবং এক্ষেত্রে তাঁকে সুমহান নিদর্শনাবলীও দেখানো হয়েছিল। অতএব উত্তরের সারসংক্ষেপ হলো, সারা কুরআনে সামান্যতমও এবং এক বিন্দুও এমন কথা নেই যাতে প্রমাণ হতে পারে যে আঁ হযরত (সা.) তাঁর নবুওয়ত অথবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সম্পর্কে এতটুকুও সন্দিহান ছিলেন। বরং সুনিশ্চিত ও অকাট্য সত্য হলো, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ আশিসময় সত্তায় পরিপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস, স্বচ্ছজ্ঞান ও পূর্ণতম তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়ার যে দাবী করেছেন এবং এর পরিপূর্ণ প্রমাণ দিয়েছেন তা আজ পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য কোন কিতাবে কখনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

فَهَلْ مَنْ يَّسْمَعُ فَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكُوْنُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ

(অর্থাৎ, অতএব কে আছে যে শ্রবণ করার পর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে এবং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়? –অনুবাদক)।

স্পষ্টভাবে জানা উচিত, ইঞ্জিলসমূহে✡ হযরত মসীহ্‌র এমন কতিপয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায়, হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁর নবুওয়ত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। যেমন, এ বাক্যটি যা তাঁর অন্তিম মুহূর্তের বাক্য ছিল বলেই ধরা যায় অর্থাৎ 'এলি এলি লিমা সাবাক্‌তানি"। এর অর্থ হচ্ছে, 'হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! তুমি আমায় কেন ছেড়ে দিলে?' দুনিয়া থেকে বিদায়-মুহূর্তে যখন কিনা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের দৃঢ়বিশ্বাস ও ঈমানের জ্যোতির্বিকাশের সময় হয়ে থাকে ঠিক তখন তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যটি উচ্চারিত হলো! তাছাড়া জনাবের এ রীতিও ছিল যে শত্রুদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে সে জায়গা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতেন। অথচ খোদা

✡ - *এসব সন্দেহ-সংশয় চারটি ইঞ্জিল থেকে সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে মথির ইঞ্জিলটি সংশয় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে (মথি : ২৭ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক)।*

তাআলার তরফ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতিশ্রুতিও পেয়ে ছিলেন। উক্ত বিষয় দুটি থেকে (হযরত মসীহ্‌র) সন্দেহ-সংশয় ও বিস্ময়-বিভ্রাট সুপ্রকাশিত। তদুপরি (ক্রুশীয় ঘটনার আগে) এমন বিষয়ে যার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে আগে থেকে তাঁর জানা ছিল, সারা রাত তাঁর কেঁদে কেঁদে দোয়া করার এটা ছাড়া আর কী অর্থ হতে পারে যে প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁকে কেবল সন্দেহই পেয়ে বসতো। এ কথাগুলো শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের (ভিত্তিহীন সব) আপত্তি তোলার কারণে লেখা হলো। নইলে, এ প্রশ্নগুলোর সহজ সরল উত্তর আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা আমাদের প্রিয় মসীহ্–যিনি মানবিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না তাঁর ওপর থেকে এ যাবতীয় আপত্তি কেবল তাঁর সম্পর্কে 'ইশ্বরত্ব' ও 'পুত্রত্ত্বে'র অপনোদনের মাধ্যমে এক পলকে তুলে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের খ্রিষ্টান ভাইদেরকে (এর জন্য) অনেক বেগ পেতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরঃ

কারও কাছে গোপন থাকা উচিত নয়, প্রশ্নকারী নিদর্শন প্রদর্শনের বিষয়টি অস্বীকার করার লক্ষ্যে যে আয়াত দু'টি থেকে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এতে করে তা কখনও প্রমাণিত হয় না। এর বিপরীতে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে অবশ্যই সেসব নিদর্শন প্রকাশিত হতে থাকে যা একজন সত্যবাদী ও পরিপূর্ণ নবীর পক্ষ থেকে হওয়া উচিত। সুতরাং এর ব্যাখ্যা ও প্রকৃত স্বরূপ নিম্নবর্ণিত বিবরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপত্তিকারী তাঁর দাবীর সমর্থনে প্রথম আয়াতটির সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে কাটছাট করে অনুবাদ পেশ করে দিয়েছেন। কাজেই সম্পূর্ণ আয়াতটি এর সাথের আরও দুটি আয়াত সহ নিম্নে দেওয়া গেল, যদ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রতিভাত হয়ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ
مُّبِيْنٌ ۝ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً
وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ (আনকাবুত 29 : 51-52)

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ (আনকাবুত 29 : 54)

অর্থাৎ তারা বলে, তার প্রতি নিদর্শনাবলী কেন অবতীর্ণ হলো না? যে সব নিদর্শন যা তোমরা চাও (অর্থাৎ আযাবের নিদর্শন) সেগুলো অবশ্য আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে এবং বিশেষভাবে তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। অর্থাৎ আমার কাজ কেবল এটুকু, যেন আযাব আসার দিন সম্পর্কে (তোমাদের) সতর্ক করি। আযাব অবতীর্ণ করা আমার কাজ নয়। এরপর আল্লাহ্‌ বলেন, (যারা নিজেদের ওপর কোন আযাবের নিদর্শন অবতীর্ণ করাতে চায়) তাদের জন্য কি রহমতের নিদর্শন যথেষ্ট নয় যা আমরা (হে রসূল) তোমার প্রতি পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলীর আকর সেই কিতাবরূপে অবতীর্ণ করেছি যা তাদের পড়ে শোনানো হয়? অর্থাৎ কুরআন করীম যা এমন একটি রহমতপূর্ণ নিদর্শন যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় যা অস্বীকারকারীরা আযাবের নিদর্শন দিয়ে পূর্ণ করতে চায়। কেননা মক্কার কাফেররা এ উদ্দেশ্যেই আযাবের নিদর্শন চাইতো যেন তা তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে 'হাক্কুল একীন' তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞানে তাদের উপনীত করে। কেবল দেখার ব্যাপারই না থাকে। কেননা কেবল দেখার নিদর্শনে তাদের ধোঁকা লাগার আশঙ্কা ছিল। ভেলকি (ইন্দ্রজাল) ইত্যাদির খেয়ালও হতে পারে। কাজেই (তাদের) এ সন্দেহ উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর করার জন্য (আল্লাহ্‌) বলেছেন, এমন নিদর্শনই চাও যা তোমাদের সত্তায় কার্যকরী হয়ে পড়ে। তাই আবার আযাবের নিদর্শনের কী প্রয়োজন? এ উদ্দেশ্য লাভের জন্য কি রহমতের নিদর্শন যথেষ্ট নয়? অর্থাৎ কুরআন শরীফ যে এর নূর ও তীব্র কিরণ পাতে তোমাদের চোখ ঝল্‌সে দেয় এবং এর সহজাত সৌন্দর্য, গুণাবলী, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ, সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্যাবলী তোমাদের এত পরিমাণে দেখায় যার মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তোমরা অক্ষম হয়ে পড়েছ। আর এগুলো তোমাদের ওপর ও তোমাদের জাতির ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলছে✡ এবং তোমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়ে বিস্ময়াতীত নানা পরিবর্তন

✡ - *এ সব অমূল্য ও অলৌকিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই কুরআন করীম মুজিযা বলে অভিহিত। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত সূরাগুলোতেও বর্ণিত রয়েছে:*

দেখাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে মৃত হয়ে পড়ে থাকা লোকেরা জীবন লাভ করে চলেছে। আর বংশ পরম্পরায় যারা অন্ধই থেকে আসছিল সেসব মাতৃগর্ভজাত অন্ধরা চোখ মেলছে। কুফরী ও খোদাদ্রোহিতার নানা ধরনের রোগব্যাধি থেকে তারা আরোগ্য হয়ে চলেছে। বদ্ধমূল কুসংস্কার ও বিদ্বেষবৎ কঠিন কুষ্ঠ এতে নিরাময় হয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে নূর পাওয়া যায়। আঁধার দূর হয়। ঐশী মিলন সহজলভ্য হয় এবং এর লক্ষণাবলী উদ্ভাসিত হয়। কাজেই চিরস্থায়ী জীবন দানকারী এই রহমতের নিদর্শন ছেড়ে তোমরা কেন আযাব ও মৃত্যুর নিদর্শন চাও? এরপর আল্লাহ বলেন, এ জাতি তো ঝটপট আযাবই

সূরা আল বাকারাহ, সূরা আলে ইমরান, সূরা আন্ নিসা, আল মায়েদা, আল আনআম, আল আ'রাফ, আল আনফাল, আত্ তাওবা, সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, আর রা'দ, সূরা ইব্রাহীম, আল হিজর, আল ওয়াকিয়া, আন নামাল, আল হাজ্জ, আল বাইয়্যেনা, আল মুজাদিলা। অতএব উদাহরণরূপে কয়েকটি আয়াত দেয়া গেল:

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
(সূরা মায়েদা 5: 17)

شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ (সূরা ইউনুস 10: 58)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ (আন্ নাহ্ল 16: 66)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا (সূরা আর্ রা'দ 13: 18)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ (সূরা আল্ হাজ্জ 22: 64)

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ
(সূরা আয্ যুমার 39: 24)

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (সূরা আর্ রা'দ 13: 29)

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ (আল্ মুজাদেলা 58:23)

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ
(আন্ নাহ্ল 16: 103)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আল্ হিজ্র 15: 10)

কামনা করে। রহমতের নিদর্শনের মাধ্যমে উপকৃত হতে চায় না। তাদের বলে দাও, আযাবের নিদর্শনাবলী নির্ধারিত সময়ের অধীন হয়ে থাকে। এ বিধান না থাকলে আযাব সংক্রান্ত নিদর্শনও কবেই অবতীর্ণ হয়ে যেতো। তবে আযাব অবশ্যই আসবে। আর এমন সময়ে আসবে যখন এরা ঠাওরও করতে পারবে না। এখন ন্যায়সঙ্গতভাবে লক্ষ্য করুন এ আয়াতটিতে কোথায় মু'জিযা প্রদর্শনে অস্বীকার করা হয়েছে? এ আয়াতসমূহতো উচ্চ স্বরে ঘোষণা করছে, কাফিররা ধ্বংস ও আযাবের নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। অতএব প্রথমত তাদের বলা হলো : দেখ! তোমাদের মাঝে জীবন প্রদায়ক নিদর্শন মজুদ

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (আল্ বাইয়্যেনাহ্ 98: 4)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (বনী ইসরাঈল 17: 89)

অর্থাৎ কুরআন করীমের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার পথের সন্ধান পাওয়া যায় এবং মানুষ (অন্ধকার থেকে বেরিয়ে) নূরের দিকে পরিচালিত হয়। কুরআন প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ভাল করে। খোদা তাআলা এমন এক পানি অবতীর্ণ করেছেন, যা দিয়ে মৃতভূমি সজীব হয়ে উঠছে। এমন পানি অবতীর্ণ করেছেন যদ্বারা প্রত্যেক উপত্যকা তার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এমন পানি অবতীর্ণ করেছেন যা দিয়ে পচা-গলা ভূমি সবুজ ও সজীব হয়ে উঠেছে। এর দরুন খোদাভীরু বান্দাদের গায়ের চামড়া শিউরে ওঠে। এর পর তাদের চামড়া এবং তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কোমল হয়ে পড়ে। স্মরণ রেখো, কুরআনের মাধ্যমে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। যারা কুরআনের অনুসারী হয়ে যায় তাদের অন্তঃ করণে ঈমান লিখে দেয়া হয় এবং রূহুলকুদুস তাদের সঙ্গী ও সহায় হয়। রূহুলকুদুসই কুরআন অবতীর্ণ করেছে যেন কুরআন মু'মিনদের হৃদয় সুদৃঢ় করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্যে হেদায়াত ও সুসংবাদবহ নিদর্শন হয়। আমরাই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করবো। অর্থাৎ বাহ্যিক ভাবেও এবং তত্ত্বগত দিক দিয়ে গুণগতমানেও কুরআন সদাসর্বদা এর আসল অবস্থায় থাকবে এবং এর ওপর ঐশী নিরাপত্তার ছায়া বিরাজমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, পবিত্র কুরআনে সার্বিক সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব, অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ এবং সেই যাবতীয় সত্য রয়েছে যা হক্কানী গ্রন্থাবলীতে দেখতে পাওয়া যায়। আর এর অনুরূপ (কিতাব) প্রণয়নে কোন মানুষ ও জিন সক্ষম নয় যদিও তারা এ কাজের জন্য একে অন্যের সহায়ক হয়ে যায়।

রয়েছে অর্থাৎ কুরআন। এটি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের ধ্বংস করতে চায় না। বরং চিরস্থায়ী জীবন দান করে। কিন্তু আযাবের নিদর্শন যখন তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হবে, সেটি তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। কাজেই অনর্থক কেন মরে যেতে চাও। তবু তোমরা যদি আযাবই চাও, তাহলে স্মরণ রেখো, সেটিও শীঘ্র আসবে। অতএব আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু এ আয়াতগুলোতে আযাবের নিদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর (সেই সাথে) কুরআন করীমে রহমতের যেসব নিদর্শন রয়েছে যা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়ে নিজ অলৌকিক প্রভাব তাদের মাঝে প্রতিফলিত করে সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু আপত্তিকারী মনে করেন, এ আয়াতটিতে 'লা নাফিয়া জিনস' দিয়ে যে মু'জিযার অস্বীকৃতি বোঝায় এতে আবশ্যকীয়ভাবে যাবতীয় মু'জিযার অস্বীকৃতি এসে পড়ে– এটা কেবল আরবী ব্যকরণ সম্পর্কে (তাঁর) অজ্ঞতা মাত্র। স্মরণ রাখা উচিত 'লা নাফি'-এর প্রয়োগ কেবল সে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ যা বক্তার কল্পনায় নির্দিষ্ট থাকে, যদিও বা তা সে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করে থাকুক অথবা ইঙ্গিতে বলে থাকুক। যেমন কোন ব্যক্তি বললো, এখন শীতের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এতে সুস্পষ্ট যে, তার স্থানীয় বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে তা বলেছে, যদিও বাহ্যত তার শহর বা এলাকার নামও সে নেয়নি। কিন্তু তার এ বাক্য থেকে এমনটি মনে করা যে, তার দাবী হলো, সমস্ত পার্বত্য (ও শীত প্রধান) দেশগুলো থেকেও শীত চলে গেছে এবং সর্বত্র প্রখর রোদ পড়তে আরম্ভ করেছে। আর এর জন্য এ যুক্তি পেশ করা, যে 'লা' সে ব্যবহার করেছে সেটি 'নাফি জিনসের' 'লা'। কাজেই এর প্রভাব দুনিয়া জাহানে পড়া উচিত- এমনটি সঠিক নয়।

মক্কার পরাজিত প্রতিমা উপাসকরা তো পরিশেষে আঁ হযরত (সা.)-এর রিসালত ও মু'জিযাগুলোকে (প্রকৃত) মু'জিযা হিসেবে মেনে নেয়। অস্বীকার করার যুগেও তারা নিছক শুষ্ক (কট্টর) অস্বীকারকারী ছিল না, বরং রোম ও ইরানে গিয়েও তারা আঁ হযরত (সা.)-কে বিস্ময়াবাক অনুভূতি থেকে যাদুকর বলে বেড়াতো, যদিও তা অসঙ্গত আঙ্গিকেই বলতো। তথাপি মু'জিযা বা নিদর্শনাবলীর কথা তারা স্বীকার করে নিতো। এরকম স্বীকৃতির উল্লেখ কুরআন করীমেও রয়েছে। মুহাম্মদী নবুওয়তের অতি উজ্জ্বল জ্যোতির নিচে চাপা পড়া তাদের ক্ষীণ ও দুর্বল বক্তব্যে কেনই বা তারা 'লা নাফি জিনস' প্রয়োগ করতে

যাবে? তাদের যদি এমনই অতি মাত্রায় অস্বীকারপূর্ণ মনোভাব হতো তা হলে তারা পরিশেষে অতি উচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করতো না। তারা তাদের সে দৃঢ় বিশ্বাসকে নিজেদের রক্ত ঝরিয়ে ও জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছিল। কুফর ও অবিশ্বাসকালীন তাদের যেসব কথা কুরআন করীমে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা এটাই যে, তারা নিজেদের দৃষ্টির সংকীর্ণতার দরুন ধোঁকায় পড়ে আঁ হযরত (সা.)-কে যাদুকর বলে ডাকতো। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (সূরা কামার 54:3)

অর্থাৎ তারা কোন নিদর্শন দেখা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা আস্ত যাদু। (সূরা কামার 54:3) আবার অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন,

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۫ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

(সাদ 38 : 5)

অর্থাৎ তাদেরই একজনকে তাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে বলে তারা অবাক হয়। আর অবিশ্বাসীরা বলে, সে যাদুকর মিথ্যেবাদী। (সাদ 38 : 5)। এখন স্পষ্ট যে, তারা নিদর্শনাবলী দেখে আঁ হযরত (সা.) কে যাদুকর বলতো, তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে সেসব নিদর্শনকেই তারা মু'জিযা বলে মেনেও নিল এবং আরবের গোটা উপদ্বীপ মুসলমান হওয়ার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র মু'জিযাসমূহের (সত্যতার) সর্বকালের জন্য সাক্ষী হয়ে গেলো। এমন লোকদের পক্ষে আবার কী করে সম্ভব যে তারা ঢালাওভাবে নিদর্শন গুলোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো এবং মু'জিযা অস্বীকারে এমন 'লা নাফিয়া' ব্যবহার করতো যা তাদের সাহস ও ক্ষমতার আওতায় পড়ে না এবং তাদের সার্বিক মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অচিন্তনীয়। বরং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কুরআন করীমে যেখানে এ রসূলের ওপর কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না বলে কাফিরদের আপত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সাথে সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে তাদের বলার উদ্দেশ্য হলো, যেসব নিদর্শন তারা চায় সেগুলো কেন অবতীর্ণ হয় না।✡

✡ - *স্পষ্ট হোক, কুরআন করীমে অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে নিদর্শন চাওয়ার প্রশ্নের উল্লেখ দু'একটি জায়গায় নয় বরং বিভিন্ন জায়গায় একই প্রশ্ন করা হয়েছে। এখন সবগুলো জায়গা সামগ্রিকভাবে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, মক্কার অবিশ্বাসীরা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে তিন ধরনের নিদর্শনের দাবী জানাতো:*

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতের 'লা নাফিয়া'কে আপনি এর রীতিনীতির আওতার বহু দূরে নিয়ে গেছেন। এ রকম 'লা নাফিয়া' আরবরা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তাদের অন্তর তো ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। তাই পরিশেষে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কেবল অল্প কয়েকজনই তাদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুত আযাবে উপনীত হয়েছিল। স্মরণ থাকা উচিত, এমন 'লা নাফিয়া' হযরত মসীহ্‌র কথায়ও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ফরিসীরা (ইহুদী উলামা) নিদর্শন দেখতে চাইলে সে আক্ষেপ ভরে বললো, 'এ যুগের লোক কেন নিদর্শন চায়? আমি তোমাদের সত্য সত্য বলছি, এ যুগের লোকদের কোন নিদর্শন দেয়া হবে না'। দেখুন মার্ক : ৮ অধ্যায়, ১১ শ্লোক। এখন লক্ষ্য করুন হযরত মসীহ্ কত পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করেছেন। আপনি চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। আপনার আপত্তি এ আপত্তিটির সামনে কোন কিছুই নয়। কেননা আপনি কেবল কাফেরদের অস্বীকারটি পেশ করেছেন। তাও

---

১) আযাবরূপে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশি মতে মক্কার কাফিররা যেসব নিদর্শন দাবী করেছিল।

২) দ্বিতীয়ত যেসব নিদর্শন আযাব অথবা আযাবের সূচনারূপে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

৩) তৃতীয়ত যেসব আযাবের কারণে গায়েবি পর্দা (তথা অদৃশ্যে বিশ্বাসের পর্দা) সম্পূর্ণভাবে উঠে যায়। এভাবে উঠে যাওয়াটা 'ঈমান বিলগায়েব'-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব আযাবের নিদর্শন প্রকাশের জন্য (কাফিরদের পক্ষ থেকে) যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলোর উত্তর কুরআন শরীফে এটাই দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অপেক্ষা কর, আযাব অবতীর্ণ হবে। তবে সে ধরনের আযাব অবতীর্ণ করায় অস্বীকার করা হয়েছে যা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তবুও আযাব অবতীর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যা পরিশেষে গাযওয়া (তথা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ)-গুলোর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের নিদর্শন দেখাতে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এ রকম প্রশ্নের উত্তর যে অস্বীকার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতো না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা কাফিররা বলতো 'আমরা কেবল তখন ঈমান আনবো যখন এমন নিদর্শন দেখবো যাতে ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সিঁড়ি নির্মাণ করে তা দিয়ে তুমি আমাদের দেখতে দেখতে আকাশে উঠে যাও আর আমরা তোমার কেবল আকাশে উঠে যাওয়া কখনো গ্রহণ করে নেব না যতক্ষণ তুমি আকাশ থেকে এমন একটি কিতাব না আন, যা আমরা নিজেদের হাতে নিয়ে পড়ে দেখবো। অথবা এমনটি কর,

আবার ঢালাওভাবে অস্বীকার নয়, বরং বিশেষ ধরনের নিদর্শনাবলী সম্পর্কিত অস্বীকার। আর এও স্পষ্ট যে শত্রুর অস্বীকার সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরযোগ্য হয় না। কেননা শত্রু বাস্তব ঘটনা বিরুদ্ধ কথাও বলে ফেলে। কিন্তু হযরত মসীহ্ তো নিজ মুখে নিদর্শন দেখাতে অস্বীকার করেছেন এবং নিদর্শন দেখানোর বিষয়টিকে নির্দিষ্ট এক যুগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে বলেছেন, 'এ যুগের লোকদেরকে কোন নিদর্শন দেয়া যাবে না'। অতএব নিদর্শন অস্বীকার বিষয়ে এর চেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা আর কী বা হতে পারে এবং এই 'লা নাফিয়া'র চেয়েও বেশি স্পষ্ট 'লা নাফিয়া' আর কী হতে পারে?

যেন সিরিয়া ও ইরাকের মত মক্কার মাটি দিয়েও নদ-নদী বয়ে যায়। কেননা মক্কায় সব সময় পানির কষ্ট থাকে। আর এ ছাড়াও পৃথিবীর সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের পরলোকগত বুযুর্গদের সবাই যেন পুনর্জীবিত হয়ে চলে আসে। আর তাদের মাঝে যেন কুসাই বিন কিলাবও থাকে। কেননা সে বৃদ্ধ সর্বদা সত্য কথা বলতো। তার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করবো, তোমার দাবী সত্যি না মিথ্যা। এসব কঠিন কঠিন মনগড়া নিদর্শনের জন্য তারা দাবী জানাতো যা উপর্যোপরি ভাবে শর্তযুক্ত ছিল। এসব কিছুর উল্লেখ কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য আরবের দুষ্কৃতিপরায়ণদের এ ধরনের আবেদন আমাদের প্রভু ও নেতা নবী (সা.)-এর উজ্জ্বল মু'জিযা ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রিসালতের পদমর্যাদার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিশেষ। আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সত্যতার জ্যোতি এসব জ্ঞানান্ধকে কত যে অক্ষম ও উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল তা খোদা তাআলাই ভাল জানেন। আর তাঁর স্বপক্ষে কত যে ঐশী সাহায্য সহায়তা ও আশিসের বারি বর্ষণ হচ্ছিল। যার ফলে চোখে তারা সর্ষে ফুল দেখতে আরম্ভ করেছিল এবং এই প্রভাব ও প্রতাপের দরুন মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া ও পালানোর উদ্দেশ্যে নিদর্শনের জন্য সেইসব অবান্তর দাবী উত্থাপন করতো। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ধরনের নিদর্শন দেখানো হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' (অদৃশ্যে বিশ্বাস)-এর পরিপন্থী। এমনিতে অবশ্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত এমন সিঁড়ি রেখে দিতে সক্ষম, যা সবাই দেখতে পায়। আর তেমনিভাবে তিনি দু চার হাজার কেন, দুই কোটি লোকও পুনর্জীবিত করে তাদের মুখ দিয়ে তাদের সন্তানসন্ততির সামনে (মুহম্মদী) নবুওয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়াতেও সক্ষম। এসবই তিনি করতে পারেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, এভাবে পরিপূর্ণ প্রকাশের দরুন সওয়াব ও প্রতিদানের ভিত্তি 'ঈমান বিল গায়েব'- এর প্রক্রিয়া তিরোহিত হয় এবং দুনিয়া হাশরের নমুনায় পরিণত

এরপর আপত্তিকারী দ্বিতীয় আয়াতের অনুবাদ পেশ করেছেন। এতেও আগের ও পরের আয়াতগুলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে তাতে আপত্তি জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আসল আয়াত এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন, আয়াতটিতে এমন একটি শব্দও নেই যা মু'জিযার অস্বীকার নির্দেশ করে। বরং সব শব্দ সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, ঐশী নিদর্শনাবলী অবশ্যই প্রকাশিত হয়েছে। অতএব এর সংলগ্ন আয়াতগুলোসহ সে আয়াতটি হচ্ছে–

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○ وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ○

(বনী ইসরাঈল 17 : 59- 60)

আল্লাহ্‌জাল্লা শানুহু বলেন, কিয়ামত দিবসের পূর্বে প্রত্যেক জনপদকে আমরা অবধারিতভাবে এমনিতেই ধ্বংস করে দেব অথবা (সেখানে) কঠোর আযাব অবতীর্ণ করবো। কিতাবে এটাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আপাতত আমরা (আযাবের আকারে পূর্বের জাতিগুলোতে ঘটে যাওয়া) কতগুলো শাস্তিমূলক নিদর্শন কেবল এ কারণেই পাঠাই না যে, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। অতএব আমরা সামূদকে সত্য নিদর্শনরূপে একটি উটনি দিয়েছিলাম। এটা আযাবের ভূমিকা বিশেষ ছিল। এটির প্রতি তারা

হয়ে পড়ে। অতএব কিয়ামতের ময়দানে পরিপূর্ণ প্রকাশের সময় যেভাবে ঈমান কোন কাজে আসে না। তেমনি (নিদর্শনের ক্ষেত্রে) উল্লেখিত পরিপূর্ণ ঐশী প্রকাশের দরুনও ঈমান আনয়ন নিষ্ফল হয়ে দাঁড়ায়। বরং ঈমান ততক্ষণ পর্যন্তই ঈমান বলে অভিহিত হয়, যতণ কিছুটা গোপনীয়তাও অবশিষ্ট থাকে। আর যখন সব পর্দাই উঠে গেল তখন ঈমান আর ঈমান থাকে না। এ কারণেই সব নবী 'ঈমান বিল গায়েব'-এর নীতি অনুযায়ী মু'জিযা দেখিয়ে এসেছেন। কোন নবী একটি কোন গোটা শহরবাসীকে পুনর্জীবিত করে তাদের দিয়ে নিজের নবুওয়তের অনুকূলে সাক্ষ্য দাঁড় করাননি অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে জনসমক্ষে তাতে বেয়ে উঠে দুনিয়াবাসীকে কখনো তামাশা দেখাননি।

জুলুম করলো। অর্থাৎ যে উটনিটির অবাধে চারা খাওয়া ও পানি পান করার দরুন হিজর শহরে বসবাসকারী সামুদ জাতির লোকেরা পানীয় পানি ও গবাদি পশুর চারাগাছের অভাবজনিত এক কঠিন কষ্ট, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিপদে পড়ে গিয়েছিল। শাস্তিমূলক নিদর্শন তো কেবল ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ শাস্তিমূলক নিদর্শন কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই হয়ে থাকে। কাজেই এমন শাস্তিমূলক নিদর্শন চাওয়ায় কী লাভ যা দেখে পূর্ববর্তী জাতিরা (তা) প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তা দেখে তারা ভীত হয় নি? (বনী ইসরাঈল 17 : 59- 60)।

এ স্থলে যেন প্রকাশ থাকে, নিদর্শন দু'রকম হয়ে থাকে– (১) ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তিমূলক নিদর্শন, যাকে 'কহ্‌রী নিদর্শনও বলা যায়; (২) সুসংবাদ ও প্রশান্তিমূলক নিদর্শন। একে 'রহমতের নিদর্শন'ও বলা যায়। ভীতিপ্রদর্শনমূলক নিদর্শন কঠোর ও উগ্র অস্বীকারকারী, বক্রহৃদয়, অবাধ্য, অবিশ্বাসী ও ফেরাউনস্বভাববিশিষ্ট লোকদের জন্য প্রকাশ করা হয় যাতে তারা ভীত হয় এবং খোদা তাআলার পরাক্রম ও প্রতাপের ভয় তাদের হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে। সুসংবাদমূলক নিদর্শন সেই সব সত্যান্বেষী ও নিষ্ঠাবান মু'মিনদের জন্য প্রকাশিত হয় যাদের অন্তর সবিনয়ে বিশ্বাসে পূর্ণতা লাভ এবং ঈমান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যাশী থাকে। সুসংবাদমূলক নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না বরং নিজ আনুগত্যপরায়ণ বান্দাদের আশ্বস্ত করা তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দেওয়া এবং ব্যকুল হৃদয়ে স্নেহ ও মমতার হাত রাখা ও প্রশান্তি দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন মজীদের মাধ্যমে মু'মিন সবসময় সুসংবাদমূলক নিদর্শন পেতে থাকে এবং ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাসে উন্নতি লাভ করতে থাকে। সুসংবাদমূলক নিদর্শনগুলোর দ্বারা মু'মিন স্বস্তি পায় এবং এতে মানুষের স্বভাবজাত ব্যকুলতা দূর হতে থাকে। তার হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআনের অনুবর্তিতার কল্যাণে মু'মিন তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সুসংবাদমূলক নিদর্শন লাভ করতে থাকে এবং আরাম ও প্রশান্তিদায়ক নিদর্শন তার ওপর অবতীর্ণ হতে থাকে, যাতে সে একীন ও মা'রেফতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে 'হক্কুল একীন' (প্রত্যক্ষ জ্ঞান)-এর পর্যায়ে উপনীত হয়। সুসংবাদমূলক নিদর্শনে এক মজার বিষয় হচ্ছে, এগুলোর অবতরণে মু'মিন যেমন দৃঢ়বিশ্বাসে, সূক্ষ্ম

জ্ঞানতত্ত্বে ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়, তেমনি এ শ্রেণীর নিদর্শনাবলীতে ভরে থাকা গোপন ও প্রকাশ্য ঐশী অনুগ্রহ, আশিস ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করার কারণে প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তারা প্রতিনিয়ত বেড়ে উঠতে থাকে। অতএব প্রকৃতপক্ষে এসব রহমতের নিদর্শনই অতি মর্যাদাপূর্ণ, অতি প্রভাবশীল ও কল্যাণময় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল উপায়বিশেষ যা আল্লাহর দিকে তাঁর পথিকদের পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও সাক্ষাৎ ভালবাসার সেই মার্গে পৌঁছে দেয় যা অলিআল্লাহ্‌দের জন্য চূড়ান্ত মার্গ হয়ে থাকে। কুরআন মজীদে সুসংবাদবহ নিদর্শনের কথা বহুলভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআন একে সীমিত বলে উল্লেখ করে নি বরং এর সত্যিকার অনুসারীগণ সদাসর্বদা এসব নিদর্শন পেতে থাকবে বলে এক চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতি দান করেছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (ইউনুস 10:65)

অর্থাৎ মু'মিনরা পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও সুসংবাদ (-বহ নিদর্শন) পেতে থাকবে। আর এগুলোর মাধ্যমে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশীপ্রেমের পথে অপরিসীম উন্নতি লাভ করতে থাকবে। এগুলো হচ্ছে খোদার কথা যা কখনো টলবে না। আর সুসংবাদবহ নিদর্শনাবলী পাওয়াই হলো মহান সফলতা।(ইউনুস 10:65) (অর্থাৎ এটাই এক সে বিষয় যা মু'মিনকে ঐশীপ্রেম ও জ্ঞানতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়)।

জানা উচিত, আপত্তিকারীর উপস্থাপিত আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা কেবল ভীতি প্রদর্শন মূলক (আযাবের) নিদর্শনের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন আয়াতটিতে وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا (আমরা ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শনাবলী পাঠিয়ে থাকি -অনুবাদক। বনী ইসরাঈল 17:60) বাক্যটি থেকে স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা খোদা তাআলার যাবতীয় নিদর্শন আযাবের নিদর্শনের মাঝেই সীমিত বলে মনে করে যদি এ আয়াতের এ অর্থ করা হয় যে 'আমরা যাবতীয় নিদর্শন কেবল ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকি এবং এর অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না' তাহলে নিঃসন্দেহে এ অর্থ প্রকাশ্যভাবে ভ্রান্ত। একটু আগেই যেমন বর্ণিত হয়েছে, নিদর্শন দুটি

উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়ে থাকে। ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে। এ দু'রকম নিদর্শনের বিষয়ই কুরআন মাজীদ ও বাইবেলে যত্রতত্র প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব নিদর্শন যখন দু'প্রকারের তখন উপরোল্লেখিত আয়াতে 'আলআয়াত' শব্দটি (যার অর্থ 'সেইসব নিদর্শন') আবশ্যকীয়ভাবে এ অর্থেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য হবে যে, 'সেইসব নিদর্শন' বলতে আযাবের নিদর্শনকে বোঝায়। কেননা এ অর্থ গ্রহণ না করলে আবশ্যকীয়ভাবে ঐশী ক্ষমতাধীন সমুদয় নিদর্শন ভীতি প্রদর্শনমূলক শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ বলে মানতে হবে। অথচ ভীতি প্রদর্শনমূলক শ্রেণীতেই সমুদয় নিদর্শন সীমাবদ্ধ বলে মনে করা সম্পূর্ণভাবে ঘটনা বিরোধী। এটা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীও সঠিক বলে গণ্য হতে পারে না এবং কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ও পবিত্রচেতা ব্যক্তির বিবেক অনুযায়ীও (সঠিক) হতে পারে না।

এখন যেহেতু পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল উপরোক্ত আয়াতে নিদর্শনের দু'টি শ্রেণীর মাঝে কেবল ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শনেরই উল্লেখ রয়েছে তাই মীমাংসাযোগ্য এ দ্বিতীয় বিষয়টি রয়ে গেলো যে এই ('মা মানা'আনা') আয়াতটির কি এ অর্থ মনে করা উচিত হবে, ভীতিপ্রদর্শমূলক (আযাবের) কোন নিদর্শনই আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নি? অথবা এমনটি মনে করা উচিত হবে যে, উক্ত শ্রেণীর নিদর্শনাবলীর মাঝে সেসব নিদর্শন প্রদর্শিত হয় নি যা পূর্ববর্তী উম্মতগুলোকে দেখানো হয়েছিল? অথবা এ তৃতীয় অর্থটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য যে, উভয় ধরনের ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শন আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, তবে সেই বিশেষ ধরনের কোন কোন নিদর্শন দেখানো হয় নি যেগুলো দেখে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মু'জিযা হিসেবে মনে করে নি?

অতএব জানা উচিত আলোচ্য আয়াতগুলোতে দৃষ্টিপাতে পুরোপুরি স্বচ্ছতার সাথে প্রতিভাত হয় যে, প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত অর্থ দু'টি কোনভাবেই সঠিক নয়। কেননা উল্লেখিত আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করা যে, 'আমরা পাঠাতে সক্ষম এমন সব ধরনের ভীতি প্রদর্শনমূলক (আযাবের) নিদর্শন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেই যাবতীয় আযাবের নিদর্শন, যেগুলো পাঠাতে আমরা

অসীম ক্ষমতা রাখি সেগুলোও এ কারণে পাঠাইনি যে তা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ অস্বীকার করেছিল'– এ অর্থটি সর্বৈব ভ্রান্ত। কেননা এটা স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ কেবল সেসব নিদর্শনই অস্বীকার করেছিল যা তারা নিজেরা দেখেছিল। কারণ অস্বীকারের জন্য অস্বীকারকৃত কোন বিষয় প্রথমে চাক্ষুষভাবে দেখা আবশ্যকীয়। যে নিদর্শন তারা এখনও দেখেইনি তা কী করে অস্বীকার করতে পারে? অথচ অদেখা নিদর্শনাবলীর মাঝে এমন উচ্চপর্যায়ের নিদর্শনও ঐশী ক্ষমতাধীন রয়েছে যা অস্বীকার করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেগুলোর সামনে সবার মাথা নত হয়ে যায়। কেননা খোদা তাআলা সব ধরনের নিদর্শনই দেখাতে পারেন। তাছাড়া ঐশী ক্ষমতা প্রসূত নিদর্শনাবলী যেহেতু অনন্ত ও অপরিসীম, কাজেই একথা কী করে সঠিক হতে পারে যে, সীমিত সময়ে সেসবগুলো তারা দেখেও ছিল এবং সেগুলো প্রত্যাখ্যানও করেছিল। সীমিত সময়ে তো সে বস্তুই দেখা যাবে যা সীমিত আকারে থাকবে। যা হোক আবশ্যকীয়ভাবে এ আয়াতের এ অর্থই সঠিক হবে : পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা যে কিছুসংখ্যক নিদর্শন দেখেছিল এবং প্রত্যাখ্যানও করেছিল, সেগুলো পুনরায় দেখানো বৃথা বলে মনে করা হয়। যেমন কিনা প্রকাশ্য ইঙ্গিতটিতেও এ অর্থই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ এ স্থলে যে সামূদজাতির উটনির কথা খোদা তাআলা উল্লেখ করেছেন সেটি এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ (বহন করে) যে, এ আয়াতটিতে বিগত ও প্রত্যাখ্যানকৃত নিদর্শনগুলোর উল্লেখ রয়েছে। আর সেগুলো ছিল ভীতিপ্রদর্শনমূলক আযাবের নিদর্শন। এ (শেষোক্ত) তৃতীয় অর্থটিই সঠিক ও যথার্থ।

তারপর এ স্থলে আরেকটি বিষয় ন্যায়পরায়ণ লোকদের লক্ষণীয় রয়েছে। এতেকরে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, وَمَا مَنَعَنَآ اَنۡ نُّرۡسِلَ بِالۡاٰيٰتِ (বনী ইস্রাঈল 17 : 60) আয়াতটিতে ঐশী নিদর্শনাবলীর অস্বীকারের পরিবর্তে বরং এর স্বীকৃতিই সাব্যস্ত হয়। কেননা 'আলআয়াত' শব্দটিতে যে 'আলিফ-লাম' এসেছে এটি আরবী ব্যাকরণ-এর নিয়মবিধির কারণে দুটি অর্থ বহন করে। এতে হয়তো 'সমগ্র' বোঝাবে অথবা 'বিশেষ' বোঝাবে। 'সমগ্র' অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতটির অর্থ হবে পূর্ববর্তীদের এ সমুদয় নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে নিদর্শন পাঠাতে বাধা দিয়েছে। আর 'বিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতটির অর্থ হবে, অবিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী বিশেষ

নিদর্শনাবলী পাঠাতে কেবল পূর্ববর্তীদের সেগুলো অস্বীকার করাটাই আমাদের বাধা দিয়েছিল। যাহোক এ উভয় ক্ষেত্রেই নিদর্শনাবলীর অবতরণ প্রমাণিত। কেননা যদি এ অর্থ হয় যে, আমরা সমূদয় নিদর্শন বিগত জাতিদের অস্বীকার করার দরুন পাঠাইনি এতে কিছুসংখ্যক নিদর্শন পাঠানো প্রমাণিত হয়। যেমন কেউ যদি বলে আমি আমার সব মাল যায়েদকে দিইনি এতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে সে তার মালের কিছু অংশ যায়েদকে অবশ্যই দিয়েছে। আর যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, কিছু সংখ্যক বিশেষ নিদর্শন আমরা পাঠাইনি তাহলে এতেও অন্য কিছু সংখ্যক নিদর্শন পাঠানো প্রমাণিত হয়, যেমন কেউ যদি বলে, 'কোন কোন বিশেষ বস্তু আমি যায়েদকে দিই নি' এতে পরিষ্কার বোঝায় অন্য কোন কোন জিনিস অবশ্যই দিয়েছি। মোটকথা যে ব্যক্তি এ আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলোর দিকে দৃষ্টি দেবে, প্রথমেই (সে দেখতে পাবে) কি-ভাবে এগুলো উভয় দিকের আযাব ও শাস্তিমূলক নিদর্শনের বৃত্তান্ত তুলে ধরছে। এরপর সে আবার দৃষ্টি দেয় এবং লক্ষ্য করে, বিভিন্ন সময়কালে খোদা তাআলার অসীম ক্ষমতায় সংঘটিত যাবতীয় নিদর্শন ও বিস্ময়কর কর্মকান্ড সমূহ যে গণনাতীত, পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের সীমিত যুগে এগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল– এমনটি অর্থ করা কি সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে? এরপর সে যেন তৃতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতার সাথে চিন্তা করে, এ স্থলে কি কেবল ভীতি প্রদর্শনমূলক আযাবের নিদর্শনের এক বর্ণনা দেয়া হয়েছে না কি সুসংবাদমূলক ও রহমতের নিদর্শনাবলীরও কিছু উল্লেখ রয়েছে? এরপর চতুর্থবার চোখ তুলে 'আল্ আয়াত' শব্দের আলিফ লাম-এর দিকেও তাকায় (এবং ভাবে) এতে কী অর্থ দাঁড়াচ্ছে? এভাবে চারবার দৃষ্টি দেয়ার পর গোঁড়ামী ও বিদ্বেষবশত সত্যপ্রিয়তার গুণ থেকে ছিটকে পড়া ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই নিজ অন্তরে কেবল একটি নয় বরং হাজার হাজার সাক্ষ্য অনুভব করতে দেখবে যে, না-বাচক শব্দটি নিদর্শনাবলীর কেবল বিশেষ একটি শ্রেণীর 'নফী' অর্থাৎ অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর ওপর এর কোন প্রভাব নেই। বরং এতে সেগুলো প্রদর্শনের কথাই বলা হয়েছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তাআলা অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন, এখন এ অবিশ্বাসীরা যেসব ভীতিপ্রদর্শনমূলক নিদর্শন দেখাতে বলেছে সেগুলো কেবল এ কারণে দেখানো

হবে না যে পূর্ববর্তী উম্মতরা সেগুলো অস্বীকার করেছে। কাজেই যেসব নিদর্শন অগ্রাহ্য করা হয়েছে, এখন বার বার সেগুলো অবতীর্ণ করা দুর্বলতার পরিচায়ক এবং অসীম কুদরতের অধিকারী আল্লাহ্‌র মর্যাদার পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতগুলোতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে আযাবের নিদর্শনাবলী অবশ্যই অবতীর্ণ হবে কিন্তু ভিন্ন রঙে ও ভিন্ন চেহারায়। হযরত মূসা (আ.) বা হযরত নূহ (আ.) ও লূত (আ.)-এর জাতি অথবা আদ ও সামূদ জাতির অবিকল সেসব নিদর্শন প্রকাশ করার কী প্রয়োজন? সুতরাং এ আয়াত সমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা অন্যান্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ জাল্লা শানুহু বলেন :

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ

(আন্‘আম 6 : 26)

وَاِذَا جَاۗءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۭ

(আন্‘আম 6 : 125)

قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ۭ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○

(আন্‘আম 6 : 58)

قَدْ جَاۗءَكُمْ بَصَاۗىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

(আন্‘আম 6 : 105)

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۭ

(আন্কাবূত 29 : 54)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ

(আন্‘আম 6 : 66)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۭ

(আন্ নামল 27 : 94)

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○ۧ

(সাবা 34:31)

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ

(ইউনুস 10:54)

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

(হা মীম্ আস্ সাজদা 41:54)

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ○ (আম্বিয়া 21:38)

অর্থাৎ এসব লোক যাবতীয় নির্দশন দেখেও ঈমান আনে না। এরপর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে। আর যখন কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বলে, আমরা কখনো মানবো না যতক্ষণ আমরাও সেসব বিষয় পেয়ে না যাই যা রসূলরা পেয়ে থাকে। বল, আমি পুরোপুরি প্রমাণ নিয়ে আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছি। আর তোমরা সে প্রমাণ দেখেও প্রত্যাখ্যান করছো। যা তোমরা শীঘ্র চাচ্ছো (অর্থাৎ আযাব) এটা তো আমার এখতিয়ারের বহির্ভূত। চূড়ান্ত আদেশ জারি করার ক্ষমতাতো আল্লাহ্‌রই। তিনিই সত্য প্রকাশ করে দেবেন। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। তিনি একদিন আমার ও তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ্ আমার রিসালতের স্বপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী তোমাদের দান করেছেন। অতএব যে-ই এগুলো সনাক্ত করে সে নিজেরই উপকার করে। আর যে-ই অন্ধ হয়ে যায় এর অপকার তারই ওপর বর্তায়। আমি তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক নই। আর তারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করে। তিনিই তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের পায়ের নিচ দিয়ে তোমাদেরকে আযাব দিতে সক্ষম। আর তোমাদের দু'দলে বিভক্ত করে একে অন্যর সঙ্গে যুদ্ধের স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম। সব প্রশংসা আল্লাহর, তিনি তোমাদের এমন নিদর্শনাবলী দেখাবেন যা তোমরা সনাক্ত করতে পারবে। আর বলে দাও, তোমাদের জন্য ঠিক এক বছরের মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে।✡ এ থেকে তোমরা পিছু হটতেও পারবে না এবং এগোতেও পারবে না। তারা জিজ্ঞেস করে এ কি সত্য? তুমি

✡- 'ইয়াওম' বলতে এখানে এক বছর বোঝায়। বাইবেলেও এ বাগধারা দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঠিক এক বছর পরেই বদরের যুদ্ধের আযাব মক্কাবাসীর উপর অবতীর্ণ হয়। এটি ছিল প্রথম যুদ্ধ।

বল, হ্যাঁ, আমার প্রভু প্রতিপালকের কসম, এটা সত্য এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বাধা দিতে পারবে না। অচিরেই তাদেরকে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাবো, তাদের দেশের চারপাশেও এবং তাদের নিজেদের মাঝেও। অবশেষে এ নবী যে সত্য, তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে পড়বে। তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবে রয়েছে। আমি অচিরে আমার নিদর্শনাবলী তোমাদের দেখাবো। অতএব আমার কাছে তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

এখন লক্ষ্য করুন, এ আয়াতসমূহে প্রয়োজনীয় নিদর্শনাবলী দেখানোর বিষয়ে কত স্পষ্ট ও অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে এমন প্রকাশ্য নিদর্শন দেখানো হবে যা তোমরা অনায়াসে ভালভাবে সনাক্ত করে নেবে। কেউ যদি বলে, আযাবের নিদর্শন সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেগুলো একদিন পূর্ণ হবে। আর আমরা এ-ও স্বীকার করি, সেসব প্রতিশ্রুতি তখনই পূর্ণও হয়ে গেছে যখন খোদা তাআলা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদের দুর্বল ও অসহায় অবস্থাকে দূর করে দিলেন, গুটি কয়েকজন থেকে তাদেরকে কয়েক হাজারে পরিণত করে দিলেন এবং তাদের মাধ্যমে মক্কার সেই কাফেরদের সবাইকে নিপাত করে দিলেন যারা মক্কায় তাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার-অনাচারের যুগে অতি অহংকারভরে বারবার আযাবের নিদর্শন চেয়েছিল। কিন্তু (প্রশ্ন হলো) এসব নিদর্শন ছাড়া আঁ হযরত (সা.) অন্যান্য নিদর্শনও দেখিয়েছিলেন এর প্রমাণ কুরআন থেকে কোথায় পাওয়া যায়? অতএব জানা উচিত নিদর্শনাবলী দেখানোর উল্লেখ কুরআন করীমের বহু জায়গায় এসেছে। কোন কোন জায়গায় পূর্বে দেখানো নিদর্শনাবলীরও উল্লেখ করেছে। দেখুন আয়াত

كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ (সূরা আন্‌আম 6: 111)

[অর্থাৎ প্রথমেও (যেমন) তারা তার সত্যতার নিদর্শন দেখে তার প্রতি ঈমান আনেনি–অনুবাদক]। কোন কোন জায়গায় অবিশ্বাসীদের অন্যায়-অবিচারের কথা উল্লেখ করে (নিদর্শনের প্রতি) তাদের এ ধরনের স্বীকৃতি বর্ণনা করেছে : "তারা নিদর্শনাবলী দেখে বলে, 'এটা যাদু'"। দেখুন আয়াত:

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (সূরা কামার 54: 3)

কোন কোন জায়গায় নিদর্শনাবলী দেখে অবিশ্বাসীরা স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআন তাদের সে সাক্ষ্য তুলে ধরেছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَ شَهِدُوْۤا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ (আলে ইমরান 3: 87)

অর্থাৎ 'তারা রসূলের সত্য হওয়ার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। আর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী তাদের কাছে এসে গেছে।' কোন কোন জায়গায় কুরআন কোন কোন নিদর্শন স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেয়। যেমন 'শক্কুল কামার' তথা চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার মু'জিযা। এটি ছিল এক মহান নিদর্শন এবং ঐশী মতাবিকাশের এক (অভিনব) দৃষ্টান্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা 'সুরমা চশমে আরিয়া' পুস্তকে তুলে ধরেছি। যিনি বিশদভাবে জানতে চান তিনি দেখে নিতে পারেন। এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে, যেসব লোক আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে সব সময় নিজেদের মনগড়া নিদর্শনের দাবী জানাতো, তাদেরই অধিকাংশ অবশেষে আঁ হযরত (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর (সত্যতার) সাক্ষীও হয়ে গিয়েছিল। কেননা পরিশেষে তারাই আবার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে দ্বীনে ইসলামকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তার দিয়েছিল। আর তারাই মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থাবলীতে তাদের চাক্ষুষ সাক্ষ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করায়। কাজেই এ যুগের লোকদের এটা কত অদ্ভূত আচরণ যে এরা ইসলামের সেই সব বুযুর্গদের অজ্ঞতার যুগের অস্বীকারগুলো আপত্তিরূপে বার বার তুলে ধরে। অথচ তারা এগুলো পরিহার করে তওবা করেছিলেন। কিন্তু এরা তাঁদের সেসব সাক্ষ্য মেনে নেয় না যা তাঁরা সত্য পথে আসার পর তুলে ধরেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মু'জিযাসমূহ তো চতুর্দিকে জ্যোতি ছড়াচ্ছে। এগুলো কিভাবে গোপন থাকতে পারে? যেসব মু'জিযা সাহাবা কিরামের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত, কেবল সেগুলোই তিন হাজার সংখ্যায় রয়েছে, আর ভবিষ্যদ্বাণী তো প্রায় দশ হাজারেরও অধিক সংখ্যক হবে যা নিজ নিজ সময়ে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং হয়ে চলেছে। তাছাড়া কুরআন করীমের এমন বিপুল সংখ্যক মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা এ যুগেও আমাদের জন্য প্রকাশ্য বিষয়াদির মত প্রতীয়মান হয়। কেউ এগুলো অস্বীকার করতে পারবে না। অতএব এগুলো হ'ল : (১) আযাবের নিদর্শন হিসেবে যে-সব মু'জিযা সে-

সময়ের কাফিরদের দেখানো হয়েছিল সেগুলো আমাদের জন্যও প্রকৃতপক্ষে এমনই নিদর্শন বিশেষ যাকে চাক্ষুষ নিদর্শনই বলা চলে। কেননা এগুলো অতি নিশ্চিৎ ভূমিকা সমূহের চূড়ান্ত এক যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বিশেষ, যা পক্ষ ও বিপক্ষ কেউ-ই কখনও অস্বীকার করতে পারে না। আর মু'জিযার ভিত্তিরূপে এ ভূমিকাটি এত স্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধ যে এসব আযাবের নিদর্শন সে-সময় চাওয়া হয়েছিল যখন আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর গুটিকয়েক সাথী মক্কায় সত্যের প্রচারের দরুন নিজেরা শত সহস্র কষ্টে ও দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত অবস্থায় ছিলেন। সেদিনগুলো ইসলাম ধর্মের এমন দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের দিন ছিল যে স্বয়ং মক্কার কাফিররা হাসি বিদ্রুপ করে মুসলমানদের বলে বেড়াতো, 'তোমরা যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাক তাহলে আমাদের হাত দিয়ে তোমরা কেন এত দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিমূলক নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছো? আর যে খোদার ওপর তোমরা ভরসা করে থাক তিনি কেন তোমাদের সাহায্য করেন না? কেন তোমরা এত অল্পসংখ্যক দল হয়ে আছ যা অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে? তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের ওপর কেন আযাব অবতীর্ণ হয় না? এসব প্রশ্নের উত্তরে মুসলমানদের সেই চরম সঙ্কটপূর্ণ সময়ে কুরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় যা কিছু কাফিরদের বলা হয়েছে তা হলো সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অসাধারণ মাহাত্ম্যকে বোঝার জন্য দ্বিতীয় ভূমিকা। সে যুগটি ছিল আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) জন্যে এত নাজুক যে প্রতিনিয়ত তাদের প্রাণ নাশের আশঙ্কা ছিল এবং চারদিক থেকে বিফলতা তাদের ঘিরে ফেলছিল। সুতরাং এরূপ যুগে কাফেরদের বারবার আযাবের নিদর্শন চাওয়ার উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় তাদের বলে দেয়া হয়েছিল, অচিরে ইসলামের বিজয় ও তোমাদের শাস্তিপ্রাপ্তির নিদর্শন তোমাদের দেখানো হবে। আর ইসলাম যে এখন এক বীজের মত দেখা যায় তা একদিন মহামহীরুহে পরিণত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আর যারা আযাবের নিদর্শন দেখতে চাচ্ছে তারা তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ধারে কাটা পড়বে এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কুফরী মতবাদ ও কাফেরদের থেকে পরিষ্কার করা হবে। আর সর্বৈব ক্ষমতা মু'মিনদের হাতে এসে যাবে। খোদা তাআলা দ্বীন-ইসলামকে আরব দেশে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যে প্রতিমা-উপাসনা আর কখনও সৃষ্টি হবে না। বর্তমান ভীতির অবস্থা সম্পূর্ণভাবে শান্তি ও নিরপত্তায় বদলে যাবে। আর

ইসলাম শক্তি লাভ করবে এবং প্রবলতর হতে থাকবে। অবশেষে অন্যান্য দেশে নিজ বিজয় ও সাহায্যের ছায়া ছড়িয়ে দেবে এবং দূর-দূরান্ত ব্যাপী এর বিজয়ধারা প্রবাহিত হয়ে পড়বে। (ইসলামের) এক বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যা দুনিয়ার শেষ মহূর্ত অবধি বিলুপ্ত হবে না।

এখন যে-ব্যক্তি এ নিদর্শনের ভূমিকামূলক উভয় অংশে দৃষ্টি নিক্ষেপে জেনে নেবে, যে যুগে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়েছিল তখন ইসলামের কী রকম দুর্দশা, বিফলতা ও বিপদের অবস্থা ছিল। আর যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা তখনকার অবস্থার কত বিপরীত ও কল্পনাতীত বরং প্রকাশ্যভাবে নিছক অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল। এরপর শত্রু ও মিত্রের হাতে সংরক্ষিত ইসলামের ইতিহাসের দিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকালে তারা দেখতে পাবেন স্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। অগণিত মানবহৃদয়ে এর প্রতাপপূর্ণ প্রভাব পড়েছে এবং পৃথিবীর পূর্বাংশে ও পশ্চিমাংশে সর্বাত্মক শক্তি ও পরাক্রমের সাথে এর প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটেছে। কাজেই তারা এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকে সর্বোতভাবে একটি সুনিশ্চিত চাক্ষুষ মু'জিযা বলে আখ্যা দেবে যাতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

(২) কুরআন মজীদের যে দ্বিতীয় মু'জিযা আমাদের জন্যে প্রকাশ্য ও চাক্ষুষ বিষয়সুলভ মর্যাদা রাখে তা হলো সেইসব অদ্ভূত পরিবর্তন যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন করীমের কল্যাণময় অনুবর্তিতায় ও আঁ হযরত (সা.)-এর সাহচর্যের প্রভাবে সাহাবা কিরামের জীবনে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন এ বিষয়টিতে লক্ষ্য করি যে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার আগে এসব লোক কিরূপ ছিল এবং তারা কী রীতিনীতি ও স্বভাব চরিত্রের লোক ছিলেন, তারপর আঁ হযরত (সা.)-এর সাহচর্য ও কুরআন করীমের অনুবর্তিতার কল্যাণে তারা কী রূপ ধারণ করেছিলেন। নৈতিক চরিত্রে, আকীদা-বিশ্বাসে, চালচলনে ও আচার-আচরণে এবং সব ধরনের অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যে মন্দ অবস্থা থেকে বেরিয়ে পবিত্র অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। অতএব যে মহান ও আসাধারণ প্রভাব তাদের মরচে ধরা অস্তিত্বকে এক অদ্ভূত সজীবতা ও উজ্জ্বলতা দান করেছিল তা দেখে স্বীকার করতে হয় এ রূপান্তর এক অলৌকিক ব্যাপার ছিল যা খোদা তাআলার বিশেষ হস্তক্ষেপে সাধিত হয়েছিল। কুরআন মজীদে

খোদা তাআলা বলেন, 'আমি তাদের মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে জীবিত করি। জাহান্নামের গহ্বরে পড়ে যেতে দেখে তাদের ভয়াবহ অবস্থা হতে উদ্ধার করি। রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করে সুস্থ করে তুলি। অন্ধকারে দেখতে পেয়ে তাদের আলো দান করি।' খোদা তাআলা এ অলৌকিকতাকে তুলে ধরার জন্য কুরআন করীমে এক দিকে আরবের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে নানা ধরনের খারাপ অবস্থায় ছিল সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং অন্য দিকে এ লোকদের সেই পবিত্র অবস্থাবলীও বর্ণনা করেছেন যা ইসলাম গ্রহণের পর তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ কুফরীর যুগে তাদের পূর্বাবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং এর পাশাপাশি তাদের সেই সব অবস্থা পাঠ করবে যা ইসলাম গ্রহণের পর দৃশ্যমান হয়েছিল সে তাদের উভয় ধরনের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সুনিশ্চিতভাবে বুঝে যাবে যে এ পরিবর্তন হলো এমন এক অলৌকিক ব্যাপার যা মু'জিযা বলে অভিহিত হওয়া উচিত।

(৩) কুরআন শরীফের যে তৃতীয় মু'জিযা আমাদের সামনে রয়েছে তা হলো এর শাশ্বত ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব। এসবই এর মর্মস্পর্শী, প্রাঞ্জল ও বাগবিদগ্ধ ভাষায় সন্নিবেশিত রয়েছে। এ মু'জিযাটি কুরআন করীমে অতি জোরালোভাবে ও জাঁকজমকের সাথে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সব শ্রেণীর মানুষ ও জিন একত্র হয়েও এর সদৃশ (কিতাব) প্রণয়ণ করতে চাইলে তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। এ মু'জিযার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে, তেরশ' বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে তবু আজ অবধি কুরআন মজীদের এ আহ্বান দুনিয়ার সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং সজোরে ঢাক বাজিয়ে 'হাল মিন মুবারিয' (কোন প্রতিদ্বন্দ্বি আছে কি) বলে চ্যালেঞ্জের পর চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোন দিক থেকে কখনো কোন সাড়া শব্দ শোনা যায় না। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সমগ্র মানবীয় শক্তি কুরআন মজীদের মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম। বরং কুরআন করীমের শতশত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাত্র একটি উপস্থাপন করে যদি এর সদৃশ্য চাওয়া হয় তা হলে দুর্বল ভিত্তিবিশিষ্ট মানবকুলের পক্ষে এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশেরও সদৃশ্য উপস্থিত করা কখনো সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ কুরআন করীমের একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো পবিত্র কুরআন যাবতীয়

ধর্মীয় জ্ঞানতত্ত্বের আধার। হক ও হিকমত (সত্যতা ও প্রজ্ঞা) সংক্রান্ত এমন কোন ধর্মীয় সত্যতা নেই যা কুরআন করীমে মজুদ পাওয়া যায় না। কিন্তু এমন ব্যক্তি কে আছে যে উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্য কোন গ্রন্থ দেখাতে পারে? এ বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে অর্থাৎ কুরআন মজীদ যে সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় তত্ত্বাবলীর আকর তাহলে সে সন্দেহপোষণকারী খ্রিষ্টান হোন বা আর্যসমাজী, ব্রাহ্মসমাজী হোন বা নাস্তিক তিনি যেভাবে ইচ্ছা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আশ্বস্ত হতে পারেন। আমরা আশ্বস্ত করানোর জন্য দায়বদ্ধ। শর্ত এটুকুই তিনি যেন সত্যান্বেষী হিসেবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাইবেলে যতগুলো পবিত্র তত্ত্ব রয়েছে অথবা দার্শনিকদের পুস্তকে যত প্রকার সত্য ও প্রজ্ঞার কথা রয়েছে তা (যত দূর সম্ভব) আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে অথবা হিন্দুদের বেদ ইত্যাদিতে ঘটনাচক্রে যেসব সত্য এসে গেছে বা আসেনি তবে যেগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি অথবা সূফীদের শতশত কিতাবে হিকমত ও মা'রেফতের যতগুলো তত্ত্বকথা আমরা অবহিত হয়েছি তা সবই কুরআন করীমে দেখতে পাই। এসব তত্ত্ব-তথ্য বরাবর ত্রিশ বছর ব্যাপী অতি গভীর ও ব্যাপক গবেষণায় আমাদের আয়ত্ত হয়েছে। এতে আমাদের কাছে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনের প্রভাব রাখে এমন কোন আধ্যাত্মিক সত্য নেই যা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ কেবল আমাদেরই অভিজ্ঞতা নয় বরং এটাই কুরআন করীমের দাবী। এর যাচাই বাছাই কেবল আমিই করিনি বরং শত সহস্র বিজ্ঞ উলামা শুরু থেকে করে আসছেন। তারাও এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছেন।

(৪) কুরআন শরীফের চতুর্থ মু'জিযা হলো এর সেই সব আধ্যাত্মিক প্রভাব, যা এতে চিরসংরক্ষিত রয়েছে। অর্থাৎ এর অনুবর্তীগণ ঐশী গ্রহণযোগ্যতার উঁচু মর্যাদায় উপনীত হয়ে থাকেন এবং ঐশী বাক্যালাপে তাদের ভূষিত করা হয়। খোদা তাআলা তাদের দোয়া শোনেন এবং স্নেহ ও কৃপাভরে তাদের উত্তর দান করেন। আর অদৃশ্যের কতিপয় গোপন কথা নবীদের মত তাদেরও অবহিত করেন। নিজ সাহায্য ও সহায়তার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে অন্যান্য লোকের তুলনায় তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেন। এটি এমন এক নিদর্শন যা কিয়ামতকাল অবধি উম্মত মুহাম্মদীয়ায় কায়েম থাকবে। অতএব এটি সর্বদা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এখনও বিদ্যমান রয়েছে ও নিজ অস্তিত্বের

প্রমাণ দিচ্ছে। মুসলমানদের মাঝে দুনিয়াতে এখনও এমন ব্যক্তি রয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে নিজ বিশেষ সাহায্য-সমর্থনে সামর্থ্যবান করে স্বচ্ছ ও সত্য ইলহাম, সুসংবাদ ও কাশ্ফ তথা দিব্যদর্শনে ভূষিত করে থাকেন।

এখন হে সত্যান্বেষী ও সত্য নিদর্শনাবলীর জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তিরা! ন্যায়বিচারের চোখ দিয়ে দেখ এবং একটু পবিত্র চিত্তে চিন্তা কর, আল্লাহ্ কর্তৃক কুরআন মজীদে বর্ণিত নিদর্শনাবলী যে কত উচ্চ পর্যায়ের ও কত উঁচু মানের এবং এগুলো প্রত্যেক যুগের জন্যই কত দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতুল্য। আগের নবীদের মু'জিযা সমূহের এখন আর চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। সেগুলো কেবল কেসসা কাহিনী মাত্র। সেগুলোর মৌলিকতা কতটুক সঠিক তা খোদা তাআলাই ভাল জানেন। বিশেষত ইঞ্জিলে লেখা হযরত মসীহর মু'জিযাসমূহ গল্প- কাহিনীরূপে অতিরঞ্জিত হওয়ার পাশাপাশি এমন সব সন্দেহ সংশয়ের লক্ষ্যস্থল, যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে এগুলোকে দেখানো বড়ই কষ্টকর। তা সত্ত্বেও আমরা যদি বড়জোর স্বীকারও করে নিই প্রচলিত ইঞ্জিলগুলোতে হযরত মসীহ্ সম্পর্কে যেমন বর্ণিত হয়েছে খোঁড়া, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অন্ধ ইত্যাদি রুগী তাঁর ছোঁয়াতে ভাল হয়ে যেতো এসব বর্ণনাই অতিশয়োক্তিশূন্য ও বাস্তবে সংঘটিত এবং এর অন্য কোন অর্থ নেই তবু এতে হযরত মসীহর বড় কোন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। প্রথমত সে কালে এমন একটি পুকুরও ছিল যাতে এক বিশেষ সময়ে ডুব দিলে ইঞ্জিলের বর্ণনানুযায়ী তৎক্ষণাৎ সাধারণভাবে সব রোগবালাই দূর হয়ে যেতো। তাছাড়া দীর্ঘ যুগের গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে রোগবিলুপ্তিকরণের নিপুণতা (ও যোগ্যতা) অন্যান্য বিদ্যার মতই এক ধরনের বিদ্যা। এতে অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ লোক এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে প্রচন্ড মনোসংযোগ ও মানসিক শক্তি ব্যয় করার ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্মোহিত করার অনুশীলনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অতএব নবুওয়তের সাথে এ বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এক্ষেত্রে মহা-পুণ্যবান ব্যক্তি হওয়াও জরুরী নয়। প্রাচীনকাল থেকে এ বিদ্যা প্রচলিত হয়ে চলে আসছে। মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ বুযুর্গ যেমন 'ফুসূসুল হিকাম' পুস্তক প্রণেতা মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী এবং নকশবন্দীদের কতিপয় বুযুর্গ একাজে বিশেষ দক্ষ হিসেবে গত হয়েছেন। তারা এমন দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছেন যে তাদের সময়কালে তাদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। বরং তাদের কারো কারো সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তারা তাদের পরিপূর্ণ মনোসংযোগের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সদ্য মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন করে দেখিয়ে দিতেন✡ এবং দু' তিন শ' রুগীকে নিজের ডানে বামে বসিয়ে কেবল এক দৃষ্টি নিক্ষেপে সুস্থ করে দিতেন। আর তাদের মাঝে যারা অনুশীলনে দুর্বল হতেন তারা হাত লাগিয়ে বা কাপড় ছুঁয়ে আরোগ্য দান করতেন। এ বিদ্যা চর্চায় সম্মোহনকারী ব্যক্তি রুগীর ওপর প্রভাব ফেলার সময় তাঁর নিজের ভেতর থেকে কোন শক্তি বের হয়ে যেতে অনুভব করতেন। অনেক সময় রুগীরও অনুভব হয় তার ভেতর থেকে একটা বিষয় বা কোন পদার্থ সঞ্চালিত হয়ে দেহের নিম্নাঙ্গে নেমে যাচ্ছে। পরিশেষে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ বিদ্যা প্রসঙ্গে ইসলামী সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ রয়েছে। আমার ধারণা হিন্দুদের মধ্যেও এ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী থাকতে পারে। সাম্প্রতিককালে ইংরেজরা মেসমেরিজম কৌশলবিদ্যা বের করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাও এ জ্ঞানেরই একটা শাখা। ইঞ্জিলে দৃষ্টি দিলে জানা যায়, এ বিদ্যায় হযরত মসীহর কিছুটা দক্ষতা ছিল কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ছিল না। সে যুগের মানুষ অত্যন্ত সাদাসিধা এবং এ বিদ্যা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। এ কারণেই সে যুগে এ বিদ্যার আমলকে সীমাতিরিক্ত প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যতই এ বিদ্যার স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে, ততই মানুষের এ সম্পর্কীয় বিশ্বাসে ভাটা পড়তে থাকে। পরিশেষে অনেকে এ অভিমত প্রকাশ করেছেন এ ধরনের চর্চার মাধ্যমে রুগীদের সুস্থ করা বা উন্মাদদের আরোগ্য দান করা মোটেও বড় কোন বিষয় নয়। বরং এ ক্ষেত্রে ঈমানদার হওয়াও জরুরী নয়। নবুওয়ত বা বেলায়াতের অনুকূলে এটি কোন প্রমাণ হতে পারে তা দূরের কথা। তাদের এটাও মন্তব্য যে, দৈহিক রোগব্যাধি নির্মূলকরণ কার্যবিধির পরিপূর্ণ চর্চা বা অনুশীলন এবং এ কাজেই নিজেকে রাতদিন নিয়োজিত রাখা রূহানী

✡- *মনোসংযোগের কার্যবিধির মাধ্যমে সদ্য মৃতদের কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টার জন্যে জীবিত হয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী নয়। যেমন আমরা স্বয়ং কোন কোন জীব মরে যাবার পর কোন ওষুধ প্রয়োগে এদের জীবিত হতে চাক্ষুষভাবে দেখে থাকি। সে ক্ষেত্রে আবার মানুষের জীবিত হওয়া কী কঠিন বিষয়! আর কেনই বা কল্পনাতীত হবে?*

উন্নতির জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর। কাজেই এ শ্রেণীর ব্যক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদীক্ষা ও তরবিয়তের কাজ খুব কমই হয়ে থাকে। তার আত্মিক জ্যোতির্ময় শক্তির চরম অবনতি ঘটে। ধারণা হতে পারে এ কারণেই বুঝি হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর আধ্যাত্মিক তরবিয়ত ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অতি দুর্বল সাব্যস্ত হন। যেমন পাদ্রী টেইলার সাহেব যিনি পদর্মাদার দিক দিয়ে আর সেই সাথে নিজস্ব (সহজাত) যোগ্যতার কারণে একজন স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হন তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করে লিখেছেন, হযরত মসীহর রূহানী তরবিয়ত ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুর্বল বলে সাব্যস্ত হয়। হাওয়ারী নামে অভিহিত তাঁর সাহচর্য প্রাপ্ত শিষ্যরা তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের গড়ে ওঠার এবং মানবীয় বৃত্তিগুলোর পূর্ণ বিকাশের কোন উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন নি। (হায়! হযরত মসীহ্ যদি তাঁর সেই বাহ্যিক রোগ-ব্যধি বিলুপ্তিকরণের কাজটির দিকে কম মনোযোগ দিতেন আর সে মনোসংযোগকেই নিজের শিষ্যদের আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও রোগব্যাধি নিরসণে প্রয়োগ করতেন, বিশেষত ইহুদা ইস্ক্রিউতির ক্ষেত্রে)। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত বিজ্ঞ পাদ্রী সাহেব এ-ও বলেন, আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের সাথে আধ্যাত্মিক তরবিয়ত তথা শিক্ষাদীক্ষা লাভ ও ধর্মীয় দৃঢ়তা দেখানোর বিষয়ে হাওয়ারীদের তুলনা করলে আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে হরযত মসীহর শিষ্যগণ আধ্যাত্মিকভাবে সিদ্ধিলাভে অত্যন্ত অপরিপক্ক ও পশ্চাদপদ। হযরত মসীহর সাহচর্য তাদের মানসিক ও আত্মিক শক্তিগুলোর তেমন কোন বিকাশ ঘটাতে পারে নি, যা আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের মোকাবিলায় একটুও প্রশংসনীয় হতে পারতো। বরং হাওয়ারীদের পদেপদে কাপুরুষতা, বিশ্বাসের দুর্বলতা, মানসিক সংকীর্ণতা, পার্থিব লোভলালসা ও অবিশ্বস্ততা সংঘটিত হতে থাকে। কিন্তু আরবী নবী (সা.)-এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন নবীর অনুসারীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অতএব এটা পরিপূর্ণভাবে সাধিত সেই রূহানী তরবিয়তেরই প্রভাব ছিল যা তাদের সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিল। তেমনিভাবে বহুসংখ্যক জ্ঞানী গুণী ইংরেজ সম্প্রতি তাদের প্রণীত পুস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আরবী নবী (সা.) সম্পর্কে বহুল বর্ণিত তাঁর মু'জিযাসমূহ থেকে পৃথক করে আমরা যদি কেবল আল্লাহ্তে তাঁর মনোনিবেশ ও নির্ভরশীলতা,

তাঁর সহজাত দৃঢ়চিত্ততা, তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র শিক্ষা, ঐশী প্রভাবশীলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অসংখ্য মানুষকে তাঁর সুধরে দেয়া এবং তাঁর প্রতি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ঐশী সাহায্য-সহায়তার বিষয়গুলোই লক্ষ্য করি তাহলেও আমাদের ন্যায়বিচার বোধ আমাদের স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত উক্ত বিষয়গুলোও অলৌকিক ও মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। আর সত্য ও প্রকৃত নবুওয়তকে সনাক্ত করার সপক্ষে এগুলো জোরালো ও যথেষ্ট নিদর্শন বটে। খোদা তাআলা কোন মানুষের সহায়ক না হলে সে এসব বিষয়ে কখনো পরিপূর্ণতা ও সফলতা লাভ করতে পারে না, এমন দৃশ্য ও অদৃশ্য সাহায্য-সহায়তায় ভূষিতও হতে পারে না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

উত্তর: খ্রিষ্টান ভদ্রলোক তাঁর ভাষায় বর্ণিত আপত্তিটিতে যে ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করেছেন তা আসলে আপত্তি নয়, বরং তা হলো তিনটি ভুল-বোঝাবুঝি বা বিভ্রান্তি যা যথার্থ চিন্তা-ভাবনার অভাবে তার মনে দানা বেঁধেছে। নিম্নে আমরা সেই সব বিভ্রান্তি নিরসন করছি: প্রথম বিভ্রান্তির নিরসনে উত্তর হলো, সত্য নবীর আদৌ এ চিহ্ন নয় যে, খোদা তাআলার মত প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে স্বকীয়ভাবে তাঁরও জানা থাকবে। বরং অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব ক্ষমতায় ও নিজ সহজাত গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অদৃশ্যে জ্ঞানবান অর্থাৎ আলেমূল গায়েব হওয়া কেবল আল্লাহ্ তাআলার সত্তারই বৈশিষ্ট্য। আদিকাল থেকে 'আহলে হক' (সত্যের ধারক প্রকৃত জ্ঞানীগণ) 'ওয়াজেবুল ওয়াজুদ' (অর্থাৎ আবশ্যিকভাবে অস্তিত্ববান) খোদার গায়েবের জ্ঞান সম্বন্ধে 'ওয়াজূবে যাতি' তথা আবশ্যিকভাবে অপরিহার্য বলে আকীদা রাখেন এবং অন্যসব সৃষ্টজীবের বেলায় আবশ্যিকভাবে অসম্ভব এবং আল্লাহ্ 'আযযা ইসমুহু'র মাধ্যমে সম্ভব বলেও বিশ্বাস পোষণ করেন। অর্থাৎ 'আলেমুল গায়েব' হওয়া খোদা তাআলার সত্তার জন্য অপরিহার্য বরং তাঁর অনাদি অনন্ত সহজাত বৈশিষ্ট বলেই তাদের বিশ্বাস। কিন্তু সমূদয় সৃষ্টবস্তু যাদের অস্তিত্ব স্বভাবত ধ্বংসশীল (হালেকা তুযযাত) এবং যাদের মৌলিকতা অবাস্তব (বাতেলাতুল হাকীকাত) উক্ত গুণে এবং অন্যান্য ঐশী গুণাবলীতেও মহান

সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের অংশীদার হওয়া জায়েয (বৈধ) নয়। কেননা সত্তার দিক দিয়ে যেমন সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের শরীক হওয়া অসম্ভব, তেমনি গুণাবলীর দিক দিয়েও অসম্ভব। অতএব যারা সৃষ্টজীবের অন্তর্ভুক্ত তাদের পক্ষে স্বীয় অস্তিত্বের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'আলেমুল গায়েব' হওয়া অসম্ভব বিষয়াদির শামিল, তারা নবীই হোন বা মুহাদ্দাস (ঐশীবাণী প্রাপক) অথবা ওলী। তবে আল্লাহ্ তাআলার ইলহাম যোগে অদৃশ্য, অজানা বিষয় ও রহাস্যাদি জানার সৌভাগ্য চিরকালই বিশিষ্ট মনোনীত বান্দারা লাভ করে এসেছেন। আর এটা আমরা একমাত্র আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার অনুসারীদের মাঝেই বিদ্যমান বলে দেখতে পাই। অন্য কারও মাঝে দেখতে পাই না।

আল্লাহ্র চিরন্তন নিয়ম এভাবেই জারী রয়েছে যে, তিনি কখনো কখনো নিজ গোপন বিষয় ও রহস্যাদির কিয়দংশ তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের জ্ঞাত করে থাকেন এবং বিশেষ বিশেষ নির্ধারিত সময়ে তাঁদের ওপর 'গায়েব' তথা অদৃশ্যের কল্যাণ-ধারা থেকে মৃদু বর্ষণ হয়ে থাকে। বরং এর মাধ্যমেই আল্লাহর পরিপূর্ণ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের নিরীক্ষা ও সনাক্ত করা হয় অর্থাৎ কোন কোন সময় ভবিষ্যতের গোপন বিষয়াদি বা কিছু গুপ্তরহস্য সম্পর্কে তাদের জানানো হয়। কিন্তু এমনটি তাদের ক্ষমতা বা ইচ্ছায় হয় না। বরং কেবল খোদা তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতা ও ইচ্ছায় এসব নেয়ামত (কল্যাণ) তারা লাভ করে থাকেন।

যারা তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী চলেন ও তাঁরই হয়ে যান এবং তাঁর মাঝেই বিলীন হয়ে যান, তাদের সাথে সে অসীম কল্যাণময় খোদার রীতি এমনটি রয়েছে যে অধিকাংশ সময়ই তাদের (দোয়া) শোনেন এবং নিজের অতীত কাজ অথবা ভবিষ্যতের ইচ্ছা তাদের কাছে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক জানানো ছাড়া (নিজে নিজে) তাদের কিছুই জানা হয় না। তারা যদিও খোদা তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু তারা তো খোদা নন। কেবল বোঝালেই বোঝেন, জানালেই জানেন, দেখালেই দেখেন, বলালেই বলেন। তারা নিজ সত্তায় কিছুই নন। মহান ঐশীশক্তি যখন নিজ ইলহাম (তথা বাণী)-এর মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তখনই তারা বলেন। আর যখন তাদের দেখানো হয় তখনই তারা দেখেন। আর যখন শোনানো হয় তখনই

তারা শোনেন এবং খোদা তাআলা যতক্ষণ কোন গোপন বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত না করেন ততক্ষণ সে বিষয় সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা থাকে না। নবীদের সবার জীবনবৃত্তান্তে এরই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হযরত মসীহ (আ.)-এর দিকেই লক্ষ্য করুন কিভাবে তিনি তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, 'সেই দিন ও মুহূর্ত সম্বন্ধে পিতা ছাড়া আকাশে বিদ্যমান ফেরেশতারাও জানে না এবং পুত্র ও অন্য কেউও জানে না' (মার্ক, অধ্যায় ১৩, শ্লোক ৩২)। তিনি আরও বলেন, 'আমি নিজে থেকে কিছুই করি না (অর্থাৎ কিছু করতে পারি না)। কিন্তু যা আমার পিতা আমায় শিখিয়েছেন কেবল সেসব কথাই আমি বলি। কাউকে সত্যপরায়ণদের মর্যাদায় উপনীত করা আমার সাধ্যাতীত। আমাকে কেন পুণ্যবান বল? পুণ্যবান কেবল একজনই অর্থাৎ খোদা' (মার্ক, অধ্যায় ১০, শ্লোক ১৮)।

মোটকথা, কোন নবী সার্বভৌম ক্ষমতাবান অথবা আলেমূল গায়েব (অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত) হওয়ার দাবী করেননি। লক্ষ্য করুন সেই অক্ষম বান্দার দিকে যাকে মসীহ্ হিসেবে অভিহিত করা হয়, আর অজ্ঞ সৃষ্টি উপাসকরা যাকে খোদা হিসেবে মনে করে বসেছে তিনি যে একজন দুর্বল ও কমজোর বান্দা এবং মৌলিক ভাবে কোনো গুণের অধিকারী নন তা তিনি কিরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে সুপ্রকাশিত করেছেন! আর সর্বশেষ যে স্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁর জীবন অধ্যায়ের অবসান ঘটে তা কত মনোরম ভাষায় বিদ্যমান! সুতরাং ইঞ্জিলে লেখা আছে, তিনি (তাঁর গ্রেফতারী পরওয়ানার খবর পেয়ে) উদ্বিগ্ন হলেন ও অত্যন্ত মর্মপীড়ায় জর্জরিত হতে লাগলেন এবং তাদের (অর্থাৎ হাওয়ারীদের) বললেন, মৃত্যুর ন্যায় আমার মর্মবেদনা বোধ হচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন (অর্থাৎ সিজদা করেন) এবং দোয়া করেন, 'সম্ভব হলে এ মুহূর্তটি যেন আমার ওপর থেকে টলে যায়। হে পিতা, সবই তোমার পক্ষে সম্ভব। এ পেয়ালা আমার কাছ থেকে টলিয়ে দাও অর্থাৎ তুমি সর্বশক্তিমান এবং আমি দুর্বল ও অক্ষম বান্দা। তুমি টলালে এ বিপদ টলে যেতে পারে।' অবশেষে তিনি 'এলি এলি লিমা সাবাকতানি' বলে প্রাণ দিলেন। এ বাক্যটির অনুবাদ হলো, হে আমার আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! আমায় কেন ছেড়ে দিলে?' (মথি, অধ্যায় ২৭, শ্লোক ৪৬)

এখন দেখুন দোয়া যদিও কবুল হয়নি কেননা, 'তকদীর মুবরাম' তথা অপরিবর্তনীয় নিয়তি ছিল, একজন অক্ষম অসহায় সৃষ্টজীবের পক্ষে সৃষ্টিকর্তার চূড়ান্ত ইচ্ছার মুখে কী-ই বা করার ছিল! কিন্তু হযরত মসীহ্ তাঁর বিনয় ও বন্দেগীর স্বীকৃতিকে এ আশায় চরম সীমায় পৌঁছে দেন যে হয়তো কবুল হয়ে যাবে। আগে থেকেই যদি তাঁর জানা থাকতো যে দোয়া অগ্রাহ্য হবে এবং কখনো গৃহীত হবে না, তাহলে তিনি সারারাত ভোর পর্যন্ত নিজের সুরক্ষার জন্য কেনই বা দোয়া করলেন? আর কেনইবা নিজেকে এবং তাঁর শিষ্যদেরও অতি তাগিদের সাথে এ বৃথা কষ্টের মধ্যে ফেললেন?

অতএব আপত্তি উত্থাপনকারীর উক্তি অনুযায়ী তাঁর (অর্থাৎ হযরত মসীহর) মনে এ ধারণাই ছিল যে পরিণাম সম্পর্কে খোদা তাআলাই জানেন। তিনি (কিছুই) জানেন না। তেমনি গোপন রহস্যাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ্র জ্ঞান না থাকায় কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাঁর ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত বলেই সেগুলো সঠিক বলে সাব্যস্ত হতো না। যেমন, তিনি বলেছিলেন 'নতুন সৃষ্টির মাঝে যখন মনুষ্যপুত্র নিজ প্রতাপের সিংহাসনে আসীন হবেন তখন (হে আমার দ্বাদশ হাওয়ারী) তোমরাও বারোটি সিংহাসনে আসীন হবে' (মথি, অধ্যায় ২০, শ্লোক ২৮)। কিন্তু এ ইঞ্জিল থেকেই স্পষ্টত জানা যায়, ইহুদা ইস্ক্রিউতির ভাগ্যে সে সিংহাসন জুটেনি। সিংহাসনে সমাসীন হওয়ার সংবাদ যদিও সে নিজ কানে শুনেছিল, কিন্তু সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য তার ঘটেনি। অতএব যথার্থভাবে এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সে ব্যক্তির মুর্তাদ হবার ও মন্দ পরিণতি হওয়ার সম্পর্কে হযরত মসীহর পূর্ব থেকে জানা থাকলে কেনইবা তিনি সিংহাসনারোহণের মিথ্যা সংবাদ শুনাতেন? আর তেমনি একবার তিনি দূর থেকে এক ডুমুর বৃক্ষ দেখে এর ফল খাওয়ার ইচ্ছায় এর কাছে গিয়ে দেখেন ও জানতে পারেন এটিতে একটিও ডুমুর নেই। তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগান্বিত অবস্থায় সে ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেন। কিন্তু এর কোন কুফল সেটিতে প্রকাশিত হয়নি। গায়েবের জ্ঞান যদি তাঁর থাকতো তাহলে তিনি ফলবিহীন গাছটির দিকে এর ফল খাওয়ার ইচ্ছায় কেনই বা গেলেন?

তেমনি একবার এক মহিলা তাঁর কাপড়ের আঁচল স্পর্শ করলে তিনি চারপাশে

জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কে আমার আঁচল স্পর্শ করেছে? অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর জানা থাকলে স্পর্শকারীর পরিচয় জানা তাঁর জন্য কোন ব্যাপার ছিল না। আর একবার তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন, 'এ যুগের মানুষ মারা যাবার আগেই এ সবকিছু (অর্থাৎ এ পৃথিবীতে মসীহর পুনরাগমন, নক্ষত্রপাত ইত্যাদি) ঘটে যাবে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না, সে যুগে কোন নক্ষত্রও আকাশ থেকে পৃথিবীতে (ভেঙ্গে) পড়েনি এবং হযরত মসীহও বিচার কার্যের উদ্দেশ্যে এ দুনিয়ায় আসেননি। সে শতাব্দী কেন, তারপর আরো আঠারোটি শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী প্রায় গত হতে চলেছে। অতএব অদৃশ্য বিষয়ে হযরত মসীহ্ যে অজ্ঞ ছিলেন এ সম্পর্কে এ কয়টি সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এগুলো অন্য কোন কিতাব থেকে নেয়া হয়নি বরং চারটি ইঞ্জিল দেখে আমি লিখেছি। অন্যান্য বনি-ইস্রাঈলী নবীরও একই অবস্থা। হযরত ইয়াকূব (আ.) নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজ গ্রামের (পার্শ্ববর্তী) বনে তার পুত্রের (অর্থাৎ ইউসুফের) ওপর দিয়ে কত কী (বিপদ) ঘটে যাচ্ছিল এর কিছুই জানতে পারেননি। হযরত দানিয়েল নবুখদনিৎসরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তার কাছে প্রকাশ করে দেননি ততদিন সে স্বপ্নের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি।

অতএব এ গবেষণায় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়, নবীর একথা বলা যে অমুক বিষয় খোদা জানেন, আমি জানি না। তা সর্বতঃ সত্য ও স্বস্থানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য এবং সর্বতোভাবে এ নবীর মর্যাদা ও তাঁর সত্য উপাসক হওয়ার প্রমাণ বিশেষ। আর এসব কথায় তার নবুয়তের পদমর্যাদায় কোন রকম ত্রুটি ঘটার পরিবর্তে বরং তার মহান প্রভুর সমীপে তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। তবে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞাত করানোর মাধ্যমে যেসব ঐশী গোপন রহস্যের বিষয় লাভ হয়ে থাকে এর কতটা আঁ হযরত (সা.)-এর লাভ হয়েছিল সে সম্পর্কে গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান আপনার কাম্য হলে আমি এর যথোপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে প্রস্তুত। তওরাত ইঞ্জিল তথা গোটা বাইবেলে নবীদের যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে এর চেয়ে হাজার খানিক হাদীসে লিপিবদ্ধ আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সংখ্যায় ও গুণগত মানে বেশি রয়েছে। যথাযথভাবে সংকলিত প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। আর সংক্ষেপে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলোর পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক

এবং অতি জোরালো ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা কুরআন করীমে মজুদ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত মুসলমানদের হাতে এগুলো কেবল কিসসা কাহিনী রূপেই থেকে যায়নি বরং তারা তো প্রত্যেক শতাব্দীতে বিজাতিদের বলে আসছে এবং এখনও বলে যে, এসব ঐশী কল্যাণ ইসলামে চিরস্থায়ীভাবে অব্যাহত রয়েছে। হে ভাইয়েরা! আসুন প্রথমে পরীক্ষা করুন এরপর গ্রহণ করুন। কিন্তু এই ক্রমাগত আহ্বানের প্রতি কেউ কর্ণপাত করেন না অথচ অকাট্য ঐশী যুক্তিপ্রমাণ তাদের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা তাদের ডাকি, তারা এগিয়ে আসেন না। আমরা তাদের দেখাই তারা দেখেন না। তারা চোখ কান আমাদের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে নিয়েছেন যাতে না শুনেন না দেখেন এবং না হেদায়াত গ্রহণ করেন।

আপত্তিকারীর দ্বিতীয় বিভ্রমটি হলো কুরআন করীমে আসহাবে কাহ্ফ তথা গুহাবাসীদের সম্পর্কে ভুল সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এটা তার নিছক দাবী। কুরআনের বর্ণনাটি কেন ভুল এ সম্পর্কে আপত্তিকারী কিছুই লেখেননি। এর মোকাবেলায় সঠিক বর্ণনা কোন্‌টি এবং তা সঠিক হওয়ার কী যুক্তিপ্রমাণ যাতে তার উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় এবং যাতে এর যথাযথ উত্তর দেয়া যায়, কুরআনের বর্ণনার বিরুদ্ধে আপত্তিকারীর কোন তত্ত্ব-তথ্য থাকলে তা অজুহাত সহ পেশ করা উচিত ছিল। অজুহাত পেশ না করে একে কেবল ভুল বলে আখ্যা দেয়া সত্যান্বেষী ব্যক্তির কাজ নয়।

তৃতীয় বিভ্রম যা আপত্তিকারীর মনে উদ্রেক হয়েছে তা হলো, কুরআন করীমে এক বাদশার ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ রয়েছে, যিনি ভ্রমণ করতে করতে এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন যেখানে তিনি সূর্যকে কর্দমাক্ত এক জলাশয়ে ডুবে যেতে দেখতে পেলেন। এ ক্ষেত্রে খ্রিষ্টান মহোদয় রূপক বিষয় থেকে বাস্তবের দিকে ঘুরে গিয়ে এ আপত্তি উত্থাপন করেন যে, সূর্য এতো বিশাল হয়েও এমন ছোট্ট কর্দমাক্ত জলাশয়ে কী করে লুকালো? তার এ কথাটি এমনই যেমন কেউ যদি বলে, ইঞ্জিলে হযরত মসীহ্ (আ.)-কে খোদার ভেড়া বলে লেখা আছে এটা কী করে হতে পারে? ভেড়া তো এমন কেউই হতে পারে যার মাথায় সিং এবং দেহ জুড়ে পশম ইত্যাদিও থাকবে এবং সে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় অধোমুখ হয়ে বিচরণ করবে। আর সে সেইসব কিছু খাবে যা ভেড়া

খেয়ে থাকে।

হে মহোদয়, আপনি কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনলেন কুরআন করীম কর্দমাক্ত জলাশয়ে সূর্য ডুবে ছিল বলে দাবী করেছে? কুরআন করীম তো কেবল কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা তুলে ধরার পদ্ধতিতে এটুকু বলেছে, সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে সূর্য কর্দমাক্ত জলাশয়ে ডুবছে বলে মনে হয়েছে। এতে কেবল সে ব্যক্তির পর্যবেক্ষণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ সে এমন এক জায়গায় পৌঁছলো যেখানে সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূর্য কোন পাহাড় কিম্বা জনপদ বা বৃক্ষরাজির আড়ালে লুকোতে দেখা যাচ্ছিল না, বরং কর্দমাক্ত জলাশয়ে অস্তমিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। এমনটি বলার উদ্দেশ্য হলো, সে জায়গায় নিকটবর্তী কোন জনপদ বৃক্ষরাজি বা পাহাড়-পর্বত ছিল না। যত দূর ব্যাপী দৃষ্টি কাজ করে এসব কিছুর কোনটির চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে দেখা যায় নি। কেবল বিস্তর এক কর্দমাক্ত জলাশয় ছিল যাতে সূর্য অস্তমিত হতে দেখা যায়।

এ আয়াতগুলোর পূর্বাপর বিষয়বস্তুর যোগসূত্রের দিকে লক্ষ্য করুন, এখানে গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধানের বর্ণনাও রয়েছে বটে। তবে (তথ্যগতভাবে) কেবল এক ব্যক্তির দূরদূরান্ত ব্যাপী ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে। আর এসব বিষয় বর্ণনা করার মাধ্যমে মূলত এ (ঐতিহাসিক) তথ্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে সে ব্যক্তি এক অনাবাদ এলাকায় পৌঁছেছিলেন। অতএব এ ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার তত্ত্ব তথ্যের প্রসঙ্গ তুলে দেয়া একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বই আর কী? যেমন কেউ যদি বলে, 'আজ রাতে মেঘ ইত্যাদি না থাকায় আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল এবং তারকাগুলো আকাশের বিন্দু কণার মত ঝলমল করতে দেখাচ্ছিল। আর সে জ্যোতির্বিদ্যার বই পুস্তক খুলে বসে এবং এ বলে ঝগড়া বাঁধায় তারকা কি বিন্দু কণার সমান? তার এই কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ বলে গণ্য হবে। কেননা এক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য বাস্তবধর্মী বিষয় বর্ণনা করা নয় বরং মানুষের রূপকার্থে কথা বলার ন্যায় সে-ও এ কথাটি বলেছে। হে যারা নিজেদের 'ইশায়ে রব্বানী' (ইস্টার) অনুষ্ঠানে হযরত মসীহর রক্ত পান কর এবং তাঁর মাংসও খেয়ে থাক তোমরা কি রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে এখনও জান না প্রতিটি দেশে মানুষের দৈনন্দিন

কথোপকথনে রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহারের দুয়ার যে সুপ্রশস্ত তা সবারই জানা? 'ওহী ইলাহী' রূপকাশ্রিত সেইসব বাগধারাই অবলম্বন করে যা জনসাধারণ সরলভাবে নিজেদের দৈনন্দিন প্রাসঙ্গিক কথোপকথনে অবলম্বন করে থাকে। সর্বত্র দর্শনের সূক্ষ্ম পরিভাষার অনুসরণ করা ঐশীবাণীর নিয়মিত পদ্ধতি নয়। কেননা জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করেই তার বক্তব্য। তাই মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বোঝার ক্ষমতানুযায়ী এবং তাদের বাগধারায় কথা বলা আবশ্যক। শাশ্বত সত্য সূক্ষ্মজ্ঞান-তত্ত্ব এবং অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ বর্ণনা করা যথাস্থ। কিন্তু বাগধারা ছেড়ে দেয়া এবং প্রচলিত রূপক ও অলঙ্কারিক ভাষা সম্পূর্ণ পরিহার করা কখনো সে ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নয় যার জন্য জনমানবের রুচি অনুযায়ী কথা বলা তার পদাধিকার মূলক অবশ্য কর্তব্য। যাতে তারা তার কথা বোঝে এবং তাদের হৃদয়ে তা রেখাপাত করে। কাজেই এটা সর্বস্বীকৃত যে, এমন কোন ঐশী গ্রন্থ নেই যাতে রূপকাশ্রিত বাগধারাকে পরিহার করা হয়েছে বা এমনটি করা সঙ্গত বলে গণ্য করা হয়েছে। দুনিয়াতে কোথাও কি কোন ঐশীবাণী এমনটি এসেছে? আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই, আমরা নিজেরা দৈনন্দিন কথোপকথনে শত শত রূপক ও অলঙ্কারিক ভাষায় কথা বলে থাকি এবং কেউ এতে আপত্তি উত্থাপন করে না। যেমন বলা হয়ে থাকে : 'হেলাল' (প্রথম রাতের চাঁদ-অনুবাদক) চুলের মত সরু; তারকাগুলো বিন্দু কণাবৎ; চাঁদ মেঘের ভেতর লুকিয়ে পড়েছে কিংবা 'এখনই দিনের উদয় হলে সূর্য এ বেলায় এক হাত পরিমাণ উপরে উঠেছে অথবা আমরা পোলাওয়ের এক গামলা বা শরবতের এক গ্লাস খেয়ে ফেলেছি। কিন্তু এসব কথায় কারো মনে এ খট্‌কা বাঁধে না, হেলাল কী করে চুলের মত সরু হতে পারে? তারকাগুলো কিভাবে বিন্দুবৎ হতে পারে? অথবা চাঁদ কী করে মেঘের ভেতর লুকোতে পারে? প্রবল বেগবান সূর্য তো এক মুহূর্তে শতসহস্র মাইল দ্রুত বেগে চলে। সে এক বেলায় কী করে মাত্র এক হাত পরিমান দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে? কিংবা পোলাওয়ের গামলা খাওয়াতে বা শরবতের গ্লাস পান করায় কেউ এমনটি মনে করে না যে গামলা ও গ্লাস টুকরো টুকরো করে খেয়েছে। বরং এটাই মনে করবে এগুলোর মধ্যে যে পোলাও বা শরবত রয়েছে কেবল তাই খেয়েছে। অত্যন্ত পরিষ্কার বিষয়ে আপত্তি তোলা কোন বিজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীও পছন্দ করেন না। ন্যায়পরায়ন খ্রিষ্টানদের কাছে আমরা নিজেরা শুনেছি এ

ধরনের আপত্তি তাদের মাঝে সেইসব লোকই করে থাকে যারা অজ্ঞ অথবা চরম পর্যায়ের গোঁড়া।

আল্লাহর বাণীতে রূপকভাবে কোন কিছু বর্ণিত হলে সেটিকে (স্থূল) বাস্তবার্থে ধরে নিয়ে আপত্তির লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা কি কোন সত্যান্বেষীর পরিচয় হতে পারে? এভাবে তো কোন ঐশী গ্রন্থই আপত্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না। সামুদ্রিক জাহাজে সফরকারী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন এ বিচিত্র দৃশ্য দেখে থাকেন যে সূর্য পানি থেকেই উদিত হয় এবং পানিতেই অস্ত যায়। আর এমনটি দেখে তারা প্রায়শ একে অন্যকে বলে থাকেন, 'এটি উদিত হলো, আবার পানিতেই ডুবে গেলো।' এখন এটা স্পষ্ট যে, এ কথোপকথনের সময় জ্যোতির্বিদ্যার বই পুস্তক তাদের সামনে খুলে সৌর জগতের তথ্য ফলাতে বসার মানে হলো উত্তরে এ কথা শোনা: 'হে পাগল! এ জ্ঞান কি কেবল তোমারই জানা? আমাদের জানা নেই?'

খ্রিষ্টান মহোদয় কুরআন করীমের বিরুদ্ধে তো আপত্তি করলেন কিন্তু ইঞ্জিলের সেসব জায়গার কথা ভুলে গেলেন যেগুলোতে সত্যি সত্যি ও যথার্থই আপত্তি ওঠে। যেমন উদাহরণ রূপে দেখুন মথি ও মার্কের ইঞ্জিলে লেখা আছে "মসীহকে তোমরা মানুষের বিচার কার্যের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে তখন নামতে দেখবে যখন সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে চাঁদ তার আলো দেবে না ও নক্ষত্রগুলো (আকাশ থেকে পৃথিবীতে) খসে পড়বে।" এখন জ্যোতির্বিদ্যাই এ প্রশ্নের উদ্ভব ঘটায় যে সব তারকা পৃথিবীতে পড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছিটিয়ে পড়লে সেগুলোর আঘাতে কি মানুষের কোন কষ্ট বা ক্ষতি হবে না বরং সবাই তখন নিরাপদ ও জীবিতই থাকবে? অথচ একটি নক্ষত্রের পতন ঘটলেও পৃথিবীবাসীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া এটাও চিন্তা করার বিষয় যে নক্ষত্ররাজির পতন পৃথিবীবাসীকে যখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে তখন 'আমাকে তোমরা মেঘ পুঞ্জে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে'- হযরত মসীহর এ উক্তি কী করে সত্য সাব্যস্ত হবে? মানুষ যখন সহস্র সহস্র নক্ষত্রের নিচে চাপা পড়ে মরে পড়ে থাকবে তখন মসীহকে অবতীর্ণ হতে কে দেখবে? আর পৃথিবী যে নক্ষত্ররাজির আকর্ষণেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা কিভাবে নিজ স্বাভাবিক ও সঠিক অবস্থায় বজায় থাকবে? আর মসীহ্ (ইঞ্জিলে যেমন

লেখা আছে) কী করে মানোনীত লোকদের দূর দূর থেকে আহ্বান করবেন এবং কাদের তিনি তিরষ্কার ও সতর্ক করবেন? কেননা নক্ষত্ররাজির পতন তো প্রকাশ্যভাবে সবার মৃত্যু ও সবকিছুর ধ্বংস বরং গোটা পৃথিবীর ওলট পালট হয়ে যাওয়ার কারণ হবে। এখন লক্ষ্য করুন, (ইঞ্জিলের) এসব বর্ণনা জ্যোতির্বিদ্যার পরিপন্থী কি না? তেমনি জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে আরো একটি আপত্তি ওঠে। সেটি হলো মথির ইঞ্জিলে লেখা আছে, 'যে নক্ষত্রটি তারা (অর্থাৎ অগ্নি উপাসকরা) পূর্ব দিকে দেখেছিল সেটি তাদের সম্মুখ দিয়ে এগোচ্ছিল। আর যেখানে ছেলেটি (অর্থাৎ শিশু মসীহ্) ছিল সেখানে গিয়ে থেমে গেল' (মথি, অধ্যায় ২, শ্লোক ৯)।

এখন খ্রিষ্টান মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে দিন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী এ অদ্ভূত তারকাটির নাম কী, যা অগ্নি উপাসকদের পদাঙ্কে ও তাদের সাথে সাথে চলতো? আর এটা কী ধরনের চলা এবং এর সে কী রকম গতি ছিল? আর এভাবে এর চলা (জোতির্বিদ্যার) কোন্ নিয়ম নীতি অনুযায়ী সাব্যস্ত ও স্বীকৃত? আমি জানি না মথির ইঞ্জিল এরূপ তারকা সম্পর্কে জ্যোতির্বিদদের পশ্চাদধাবন থেকে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে। কোনো কোনো খ্রিষ্টান মহোদয় নিরূপায় হয়ে এ উত্তর দেন, "এটি হযরত মসীহর উক্তি নয়, বরং মথির ভাষ্য। আর এটিকে আমরা ঐশীবাণী বলে বিশ্বাস করি না।" এটি এক চমৎকার উত্তর। এতে ইঞ্জিলের ঐশীবাণী হওয়ার মুখোশ খুলে গেছে। আর আমি তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিয়েও বলছি এটা যদিও মসীহর উক্তি নয়, বরং এটি মথির ভাষ্য। কিন্তু (ঐশীবাণী বলে স্বীকৃত) হযরত মসীহর সেই উক্তিওতো হুবহু এরই মত ও এরই অনুরূপ (যা ইতঃপূর্বে আমার পক্ষ থেকে আপত্তিসহ বর্ণিত হয়েছে)। সম্ভব হলে সেটিকেই জ্যোতির্বিদ্যার নিয়ম বিধি সম্মত বলে সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিন। আর সেই সাথে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে এ ভাষ্যটি ঐশীবাণী নয়, বরং মানুষের পক্ষ থেকে ইঞ্জিলে মেশানো হয়েছে। এমতে যেসব ইঞ্জিল আপনাদের হাতে রয়েছে সেগুলোকে আপনারা কেন আবার এগুলোর যাবতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত করেন? কেন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন না যে হযরত মসীহর মুখ নিঃসৃত কয়েকটি কথা ছাড়া ইঞ্জিলে আর যা কিছু লেখা আছে তা সবই সংকলনকারীরা

কেবল তাদের খেয়াল খুশিমত ও নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী লিখেছেন? এগুলো ভুল-ত্রুটিমুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেমন কিনা পাদ্রী সাহেবানের সাধারণ লেখা থেকে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে এ অভিমতটির সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি ছড়ানো হয়েছে অর্থাৎ সর্ব সম্মতিক্রমে ইঞ্জিলগুলোর সম্পর্কে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে এগুলোতে ঐতিহাসিকভাবে যেসব মু'জিযার উল্লেখ পাওয়া যায় তা কোনো ঐশীবাণী নয় বরং ইঞ্জিল সংকলকগণ নিজেদের ধারণা বা শ্রুতি ইত্যাদি বাহ্যিক সূত্রগুলোর মাধ্যমে লিখে দিয়েছেন। মোটকথা পাদ্রী সাহেবান তাদের এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে আক্রমণগুলো থেকে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই চারি ইঞ্জিলের প্রত্যেকটিতে এর প্রায় দশ ভাগই মানুষের বাণী এবং মাত্র একভাগ খোদার বাণী বলে মেনে নিয়েছেন। আর এসব স্বীকৃতির কারণে তাদের যেসব ক্ষতি বরণ করতে হয়েছে সেগুলোর একটি হলো, যিশুর মু'জিযাসমূহ তাদের হাতছাড়া হয়ে পড়েছে। এ সব মু'জিযার কোনো সন্তোষজনক সনদ ও পর্যাপ্ত প্রমাণ তাদের কাছে আর থাকলো না। কেননা ইঞ্জিল লেখকগণ যদিও ঐতিহাসিকভাবে কেবল নিজেদের পক্ষ থেকে সাজিয়ে মসীহর মু'জিযাসমূহ ইঞ্জিলগুলোতে লিখেছেন। কিন্তু ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত মসীহর নিজস্ব বর্ণনা হাওয়ারীদের বর্ণনার সর্বতোভাবে বিপরীত ও পরিপন্থী বরং এগুলো স্ববিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়। কারণ ঐশীবাণী বলে আখ্যায়িত মসীহ্ তাঁর নিজস্ব বর্ণনায় জায়গায় জায়গায় মু'জিযা দেখাতে কেবল অস্বীকারই করেছেন এবং মু'জিযা প্রার্থনাকারীদের কোন মু'জিযা দেখানো হবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হিরোডিসও মসীহর কাছে মু'জিযা দেখতে চাইলে তিনি তাকে তা দেখান নি। তেমনি আরও অনেকে তাঁর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছে এবং নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর কাছে অনুরোধও করেছে। কিন্তু তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন এবং কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। বরং তিনি ইহুদীদের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে সারা রাত জেগে খোদা তাআলার কাছে নিদর্শন প্রার্থনা করেন। কিন্তু এ নিদর্শনটিও তিনি লাভ করতে পারেন নি এবং তাঁর দোয়া অগ্রাহ্য করা হয়।

এরপর তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলে ইহুদীরা আন্তরিকভাবে তাঁর কাছে নিবেদন জানায়

তিনি যদি এ মুহূর্তে ক্রুশ থেকে জীবিতাবস্থায় নেমে আসেন তাহলে তারা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তিনি (ক্রুশ থেকে) নামতে পারেন নি। অতএব এ যাবতীয় ঘটনা থেকে সুস্পষ্টত প্রতিভাত হয়, ইঞ্জিলে যে কতিপয় ঐশীবাণী রয়েছে তা হযরত মসীহ্‌র মু'জিযার অধিকারী হওয়ার অস্বীকার করে। আর যদি এমন কোন বাণী থাকেও যা মসীহ্‌র মু'জিযার অধিকারী হওয়ার ধারণা দিতে পারে তা আসলে বহুবিধ অর্থ-বোধক বাক্য। এগুলোর প্রত্যেকটির বিভিন্ন রকম আরো অর্থও হতে পারে। আর যেসব মু'জিযা ইঞ্জিল প্রণয়নকারীগণ নিজস্ব ভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে বাহ্যিক অর্থে নেয়াও আবশ্যিক বলে মনে হয় না অথবা এগুলোকে অহেতুক জোর করে সেইসব মু'জিযার সত্যায়ন হিসেবে গণ্য করাও জরুরী বলে সাব্যস্ত হয় না। আর বিশেষভাবে মসীহর মুখ নিঃসৃত এমন কোনো বাক্য নেই যা সুস্পষ্টভাবে মু'জিযাগুলোর বাস্তবায়ন সাব্যস্ত করে। বরং হযরত মসীহ্‌র জোরালো ও বিশেষ বিশেষ বাক্য এ সাক্ষ্যই দেয় যে তাঁর পক্ষ থেকে কোন একটি নিদর্শনও প্রকাশিত হয় নি✡। অবাক লাগে, খ্রিষ্টানরা কেন হযরত মসীহ্‌র সেইসব বাণীতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন না যেগুলো হযরত মসীহর বিশেষ বাণী ও ঐশীবাণী এবং তাঁরই মুখনিঃসৃত বলে অভিহিত। আর যেগুলো ঐশীবাণী নয় বলে খ্রিষ্টানরা নিজেরা স্বীকার করেন সেগুলোতে তাঁরা কেন আস্থা রাখেন? বরং যেগুলো কেবল ঐতিহাসিক ধারায় ইঞ্জিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত অথচ সর্বতোভাবে ঐশীবাণীর বহির্ভূত এবং ঐশীবাণীর বাক্যাবলীর সাথে যেগুলো বিরোধপূর্ণ সেগুলোর ওপরই কেন তারা অতি মাত্রায় জোর দেন? অতএব ঐশীবাণী এবং অ-ঐশীবাণীমূলক বাক্যাবলীতে পারস্পরিক বিরোধ থাকলে এর প্রতিকারের এক মাত্র পথ হলো যেসব বাক্য ঐশীবাণী নয় সেগুলো অনাস্থাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সেগুলোকে কেবল ইঞ্জিল প্রণয়নকারীদের অতিশয়োক্তি হিসেবে ধরে নিয়ে বিশ্বাসোপযোগী মনে করা হবে না। সুতরাং

✡ - *কুরআন শরীফে কেবল সেই মসীহর নিদর্শনাবলীর সত্যায়ন রয়েছে যিনি কখনো খোদা হওয়ার দাবী করেন নি। কেননা মসীহ (নামে) একাধিক ব্যক্তি হয়েছেন এবং হয়ে থাকবেন। তা ছাড়া পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ব্যাপক অর্থবোধক সত্যায়ন কখনো ইঞ্জিল লেখকদের বর্ণনার সত্যায়ন নয়।*

ইঞ্জিলের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অতিশয়োক্তি করা একটা সুস্পষ্ট বিষয়। যেমন যোহনের ইঞ্জিলের সর্বশেষ শ্লোকটি হলো: যীশুর আরও অনেক কর্মকান্ড রয়েছে। সেগুলো পৃথক পৃথকভাবে লেখা হলে সেসব বর্ণনাসম্বলিত পুস্তক জগতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। দেখুন এ যে কতো ভয়ঙ্কর অতিশয়োক্তি : 'পৃথিবী ও আকাশসমূহের মত সব অদ্ভূত কর্মকান্ড তো এ জগতে সঙ্কুলান হয়ে গেলো কিন্তু মসীহ্‌র তিন কি আড়াই বছর স্থায়ী জীবনের ঘটনাবলীর দুনিয়াতে সংকুলান হওয়া সম্ভব নয়। যারা এ ধরনের অতিশয়োক্তি করেন তাদের বর্ণনা কী করে আস্থাভাজন হতে পারে?

হিন্দুরাও তাদের অবতারদের সম্পর্কে এ ধরণের বই-পুস্তকই রচনা করেছিলো। আর সেগুলোতে তারা সুকৌশলে মিথ্যার বেসাতি সাজিয়ে দিয়েছিলো। এর দরুন এ জাতির ওপরও অত্যন্ত তীব্র ও জোরালো প্রভাব পড়েছিল। সুতরাং দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাম ও কৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে। সংকলিত যেসব পুস্তক অজস্র মিথ্যায় ভরা থাকে সেগুলো হলো প্রকৃতপক্ষে সেইসব কবরের মত যা উপর দিয়ে খুব পালিশ করা হয় এবং দেখতে সাদা-ঝকঝকে কিন্তু ভিতর দিয়ে খালি হয়ে থাকে। এগুলোর ভিতরের অবস্থা শত শত বছর পরবর্তী লোকেরা কী করেই বা জানতে পারতো, যাদের হাতে এসব স্বরচিত বই-পুস্তক এখন কল্যাণজনক ও নিঃস্বার্থ দেখিয়ে তুলে দেয়া হয় যেন এ অবস্থায় ও আকারেই এগুলো আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এগুলোর সমষ্টি আসলে কিভাবে তৈরী করা হয়েছে সে সম্পর্কে ওরা কীই বা জানতো। দুনিয়াতে এমন প্রখর দৃষ্টি সম্পন্ন লোক অতি বিরল যারা সব পর্দা ভেদ করে ভেতরে গভীরে ঢুকে যায় ও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয় এবং চোরকে ধরে ফেলে। বস্তুত বানানো মিথ্যার যাদুর প্রভাবে প্রভাবিত মানবাত্মা এতো বেশি সংখ্যক যে তা অনুমান করা কঠিন। এভাবেই এক জগৎ (বিরাট জনগোষ্ঠী) ধ্বংস হয়ে যায় এবং হয়ে চলেছে। অজ্ঞ লোকেরা কোন কিছুর প্রমাণসিদ্ধ বা প্রমাণবিহীন হওয়ার জরুরী বিষয়টিতে এতটুকুও মনোযোগ নিবদ্ধ করেনি এবং মানবীয় ফন্দি দুরভিসন্ধি ও প্রক্ষেপ সংক্রান্ত মানুষের মাঝে যে একটা চিরায়ত স্বভাবজাত প্রবণতা আদিকাল থেকে চলে আসছে সে সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে চায় নি। আর এভাবেই

শয়তানের ফাঁদে তারা নিজেদের জড়িয়েছে। কোন সরল সোজা ব্যক্তির কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে তাকে দশ বিশ লাখ টাকার সোনা বানিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় কথিত সেই ধূর্ত রাসায়নিকের মত এ জাতীয় ফন্দিবাজ প্রতারকরাও অজ্ঞ লোকদের সত্য ও পবিত্র ঈমান হরণ করে এবং বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই এমন এক মিথ্যা বুযুর্গি ও মিথ্যা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এভাবে শেষমেষ তারা প্রতারণা, ধূর্ততা ও সংসারপূজায় 'নফসে আম্মারার' (তথা মন্দ কাজের আদেশ দানকারী আত্মার -অনুবাদক) পথ অনুসরণের মাধ্যমে এদেরকে নিজেদের চেয়েও নিকৃষ্ট বানিয়ে দেয়।

পরিশেষে এ গুঢ়তত্ত্বটি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে সংঘটিত অলৌকিক ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের এক কণা পরিমাণ সাক্ষ্য মসীহ্‌র মু'জিযা ইত্যাদি সম্পর্কে ইঞ্জিলের এক বিরাট স্তূপের চেয়ে এ কারণেই সহস্রগুণ অধিক মর্যাদা রাখে। কেননা সব গবেষক পাদ্রীর স্বীকৃতি অনুযায়ী ইঞ্জিলগুলোর বর্ণনা হলো স্বয়ং হাওয়ারীদের নিজেদেরই কথা। তদুপরি সেগুলো তাদের স্বচক্ষে দেখাও নয় এবং কোথাও বর্ণনাকারীদের কোন 'সনদ'ও (অর্থাৎ ধারাবাহিক শৃঙ্খলও) তুলে ধরা হয় নি। আর কোথাও স্বচক্ষে দেখার দাবীও করা হয় নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে আঁ হযরত (সা.)-এর মু'জিযা সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে তা সবই বিশেষভাবে স্বয়ং পরম সত্যবাদী ও পবিত্র খোদা তাআলার নির্দোষ সাক্ষ্য বিশেষ। তা যদি কেবল একটি আয়াতই হতো তবুও যথেষ্ট হতো। কিন্তু সব প্রশংসা আল্লাহরই যে এ সব সাক্ষ্য সারা কুরআন জুড়ে রয়েছে। এখন তুলনা করে দেখা আবশ্যক কোথায় খোদা তাআলার পবিত্র সাক্ষ্য যেখানে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আর কোথায় (ইঞ্জিলগুলোর) বানানো প্রকাশ্য মিথ্যা ও অতিশয়োক্তিপূর্ণ সাক্ষ্যসমূহ।

بہ نزدیک دانائے بیدار دل
جوئے سیم بہتر زِ صد تودۂ گِل

(অর্থাৎ বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টিতে স্বর্ণের একটি উৎস শত স্তূপ মাটির চেয়েও উত্তম-অনুবাদক)। মনগড়া বানানো কথায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এমন অনেক কিছুই ঘটেছে এবং ঘটে থাকে।

স্বয়ং খ্রিষ্টানগণ নিজেরাই স্বীকার করেন প্রারম্ভিক যুগে তাদের মাঝে অনেকেই নিজেদের প্রণীত পুস্তকে তাদের বুযুর্গদের সম্পর্কে বহু ধরনের বৈশিষ্ট্য লিখে সে সব পুস্তক খোদা তাআলার প্রতি আরোপ করতে থাকেন। তারপর দাবী করে দেয়া হতো যে এগুলো আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) কিতাব।✡ অতএব খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের যখন এমন জালিয়াতি করার পুরাতন অভ্যাসই

✡- *ইঞ্জিলগুলোতে হযরত মসীহ্‌র অলৌকিক কাণ্ড (মু'জিযা) সম্পর্কে যে সব অসঙ্গত ও প্রমাণবিহীন অতিশয়োক্তি এবং তাঁর সম্পর্কে যে সব অযথা প্রশংসা পরিলক্ষিত হয় এ সব বিষয় ইঞ্জিলগুলোতে কবে এবং কোন সময়ে সংযোজিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা কঠিন। যদিও খ্রিষ্টানরা স্বীকার করেন যে স্বয়ং ইঞ্জিল প্রণয়নকারীগণই এ সব কথা নিজ পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন। কিন্তু এ অধমের ধারণা, এ সব টীকা টিপ্পনি ধীরে ধীরে সংযোজিত হয়েছে এবং জালিয়াতকারী প্রতারকরা পরবর্তীতে এর প্রচুর সুযোগ লাভ করে থাকে। তবে স্থায়ীভাবে যে কয়টি জালি পুস্তক ঐশীবাণী বলে খ্যাতি লাভ করেছে সেগুলো খ্রিষ্টান ও ইহুদী মহোদয়গণ প্রারম্ভিক কালেই প্রণয়ন করে প্রকাশ করে ছিলেন। সুতরাং এ জালিয়াতির সুবাদেই একটি ইঞ্জিলের পরিবর্তে বহু সংখ্যক ইঞ্জিল প্রকাশিত হলো। স্বয়ং খ্রিষ্টানদেরই বর্ণনা যে মসীহ্‌র পরবর্তীকালে অনেকগুলো জাল ইঞ্জিল প্রণীত হয়েছে। যেমন– এগুলোর মধ্যে একটি বর্ণবাসের ইঞ্জিলও রয়েছে। এ হলো খ্রিষ্টানদের বর্ণনা। কিন্তু আমার মতে (উল্লেখিত) এ ইঞ্জিলসমূহে এবং প্রচলিত চারটি ইঞ্জিলে যেহেতু বহুল পরিমাণে স্ববিরোধ রয়েছে, এমনকি বর্ণবাসের ইঞ্জিল মসীহ্‌ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বলেও অস্বীকার করে এবং ত্রিত্ববাদের মতবাদেরও বিরোধী এবং মসীহর ইশ্বরত্ব ও পুত্রত্বের বিশ্বাসটিও স্বীকার করে না। আখেরুযযামান নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আগমন সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় সুসংবাদ দেয়। কাজেই খ্রিষ্টানরা যে ইঞ্জিনগুলোকে প্রচলিত করেছিল সেগুলোই সত্য এবং যেগুলো এর বিরোধী তা সবই মিথ্যা তাদের এই প্রমাণ বিহীন দাবীটি কী করে মেনে নেয়া যায়? তাছাড়া খ্রিষ্টানদের মধ্যে যখন জালিয়াত করার এতই জোরে শোরে প্রচলন ছিল যে কিছু সংখ্যক সিদ্ধহস্ত ওস্তাদ গোটা গোটা ইঞ্জিলও নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা করে সাধারণভাবে জাতির মাঝে প্রকাশ ও বিস্তার দিয়েছেন এবং এতে করে তাদের গায়ে (কলঙ্কের) ছিঁটে ফোটাও পড়েনি। তাই তাদের কাছে কোন কিতাবকে প্রক্ষিপ্ত করে ফেলা কোন ব্যাপারই ছিল না। তদুপরি এও যখন*

চলে আসছে তখন মথি ইত্যাদি ইঞ্জিলগুলোকে কেনই বা এ অভ্যাসের (গন্ডীর) বাইরে রাখা হবে এর কোন কারণ আছে বলে জানা যায় না। অথচ সেই মহাজনের মত, যার দিনপঞ্জি ও খাতাপত্র যেমন হিসাবের প্রকাশ্য গরমিল ও সন্দেহ-সংশয়ের দরুন (নিজ) গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেয়, তদ্রূপ এ চার ইঞ্জিলের প্রত্যেকটি থেকেই (উল্লেখিত তাদের) সেই কার্যকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ছে যা তারা গোপন করতে চেয়েছিল। এ কারণেই ইউরোপ ও আমেরিকায় চিন্তাশীল লোকদের মনে সন্দেহ-সংশয়ের এক ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। আর যে ত্রুটিপূর্ণ, পরিবর্তিত ও জড় খোদার দিকে ইঞ্জিল মানুষকে আহ্বান জানায় তা গ্রহণ করার চেয়ে নাস্তিক হিসেবে থাকা তারা বেশি পছন্দ করে। সুতরাং আমার এক জ্ঞানী ইংরেজ বন্ধু আমেরিকা থেকে তার কয়েকটি পত্রের মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে সেসব দেশে বিজ্ঞ লোকদের এমন কেউ নেই যিনি খ্রিষ্টধর্মকে ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্যত ও আগ্রহী নন। আর যদিও খ্রিষ্টানরা বিকৃত ও প্রক্ষিপ্তভাবে কুরআন করীম অনুবাদ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশ করেছে তথাপি এতে যে নূর লুকিয়ে আছে তা পবিত্রচেতা লোকদের হৃদয়ে কাজ করছে। মোটকথা, আমেরিকা ও ইউরোপ আজকাল এক অস্থির অবস্থায় রয়েছে। ইঞ্জিলের প্রকৃত

স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে মসীহ্‌র জীবদ্দশায় এসব ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ হয় নি বরং মসীহ্‌র মৃত্যুর ষাট-সত্তর বছর পর অথবা বর্ণনার ভিন্নতা অনুযায়ী এর কিছু কম বা বেশি সময় পর চার ইঞ্জিলের সমষ্টি দুনিয়ায় জন্মলাভ করে, এতে করে এ ইঞ্জিলগুলোর সম্পর্কে আরও অধিক সন্দেহের উদ্রেক হয়। কেননা এ বিষয়ের প্রমাণ দেয়া কঠিন যে সে সময় পর্যন্ত হাওয়ারীগণ জীবিত ছিলেন অথবা তাদের শক্তি-সামর্থ্য বহাল ছিল। এখন আমি এ সব কেস্‌সা সংক্ষেপ করে পাঠকদের এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বারটি ইঞ্জিল জাল এবং যে চারটি ইঞ্জিল তারা প্রচার করছেন এগুলো জালিয়াতি ও প্রক্ষেপ মুক্ত এ বিষয়টির খ্রিষ্টানগণ কখনও সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেননি। বরং এ চারটির সম্পর্কেও তারা নিজেরা স্বীকার করেন যে এগুলো খোদা তাআলার নিখুঁত বাণী নয়। তারা যদি এমনটি স্বীকার নাও করতেন তবুও ইঞ্জিলগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কেননা অন্য ইঞ্জিলগুলো জাল এবং এ চারটি জাল নয় এ বিষয়ের প্রমাণের দায়ভার তাদের ওপর ন্যাস্ত। এ থেকে তারা এখনো মুক্ত হতে পারেন নি।

সত্যের বিরোধী বিশ্বাসগুলো তাদের দারুণ অস্থিরতার আবর্তে ফেলে দিয়েছে। অবশেষে তাদের কেউ কেউ এ ধারণাও প্রকাশ করেছে যে মসীহ বা ঈসা নামে আসলে কখনো কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করেন নি। বরং এতে সূর্যকে বোঝায় এবং বারজন হাওয়ারী বলতে আকাশের বারটি 'বুর্জ' (কক্ষপথ) বোঝায়।

অতঃপর এই খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত স্বরূপ বিশেষত এ বিষয়টি থেকে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে হযরত মসীহ্ ঈমানদারদের জন্য যেসব চিহ্ন নির্ধারণ করে ছিলেন সেগুলোর একটিও এ লোকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মসীহ্ বলেছিলেন, তোমরা আমার অনুবর্তিতা করলে প্রত্যেক প্রকার আশিস ও বরকত এবং ঐশীগ্রহণযোগ্যতায় আমারই রূপ ধারণ করে ফেলবে। আর মু'জিযা ও কবুলিয়তের নিদর্শনাবলী তোমাদের দান করা হবে। আর তোমাদের মু'মিন হবার এটাই চিহ্ন হবে যে তোমরা নানা ধরনের ঐশী নিদর্শন দেখাতে সক্ষম হবে। তোমরা যা চাইবে তোমাদের জন্য তা-ই ঘটবে এবং কোন বিষয়ই তোমাদের জন্য অসম্ভব হবে না। কিন্তু খ্রিষ্টানদের হাতে এসব আশিসের কিছুই নেই। তারা সেই খোদা সম্পর্কে নিছক অজ্ঞ যিনি তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দোয়া শোনেন, স্নেহ ও রহমতপূর্ণ উত্তর সরাসরি তাদের দান করেন ও অদ্ভূত অদ্ভূত কাজ তাদের স্বপক্ষে সাধিত করে দেখান। কিন্তু পূর্ববর্তী সত্যপরায়ণদের যারা স্থলাভিষিক্ত ও উত্তরাধিকারী খাঁটি মুসলমান তারাও সেই খোদাকে চেনেন, তাঁর রহমতের নিদর্শনাবলী দেখে থাকেন এবং নিজেদের বিরুদ্ধবাদীদের সামনে তাঁরা অন্ধকারের মোকাবেলায় সূর্যের ন্যায় স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। আমরা বার বার লিখে আসছি এ দাবীটিকে প্রমাণবিহীন বলে মনে করা উচিত নয়। সত্য ও মিথ্যা ধর্মের মধ্যে আকাশে একটি পার্থক্য রয়েছে এবং আরেকটি রয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর পার্থক্য বলতে সেই পার্থক্যকে বোঝায় যা মানুষের বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধি এবং এ জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম এর ব্যাখ্যা করে। অতএব খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলামকে যখন এ মাপকাঠিতে যাচাই করা হয় তখন স্পষ্টত সাব্যস্ত হয়, ইসলাম হলো সেই প্রকৃতিসম্মত ধর্ম যার নীতি ও শিক্ষায় কোন বানোয়াট ও কষ্টকল্পনার লেশ মাত্র নেই এবং যার হুকুম-আহকামে কোন অভিনব ও কৃত্রিম বিষয় নেই। আর এমন কোন বিষয়ও নেই

যা জোরপূর্বক স্বীকার করানো হয়। আর খোদা তাআলা যেমন বহুস্থলে নিজেই বলেছেন, কুরআন শরীফ প্রাকৃতিকবিধানের সমূদয় জ্ঞানতত্ত্ব এবং এর যাবতীয় সত্য স্মরণ করিয়ে দেয়, এর গভীর রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটন করে এবং এর পরিপন্থী নতুন কোন বিষয় উপস্থাপন করে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরই সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ত্ব উন্মোচিত করে। এর বিপরীতে ইঞ্জিলের বরাতে দেয়া খ্রিষ্টানদের শিক্ষা এমন এক নতুন খোদা তুলে ধরছে যাঁর আত্মহত্যায় জগদ্বাসীর গোনাহ ও আযাব থেকে পরিত্রাণ নির্ভরশীল, যাঁর দুঃখকষ্ট সোয়ায় মানুষের সুখ নির্ভরশীল এবং তাঁর বেইজ্জত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় মানুষের সম্মান লাভ নির্ভরশীল বলে ধারণা করা হয়েছে। আবার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন অদ্ভূত খোদা যার জীবনের একাংশ জড়দেহ ও এর দোষত্রুটি মুক্তাবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে এবং তাঁর জীবনের অপরাংশ (কোন অজ্ঞাত দুর্ভাগ্যের কারণে) চিরস্থায়ী জড়দেহ বরণ ও সীমায়িত হওয়ার বন্দীত্বের শিকার হয়ে পড়েছে, এবং রক্ত মাংস হাড় গোড় ইত্যাদি সবকিছুই তাঁর (আত্মার) জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। আর চিরস্থায়ীভাবে তাঁর এই জড়দেহ ধারণের কারণে তাঁকে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়। অবশেষে দুঃখ-কষ্টের আতিশয্যে তিনি মারা যান। তারপর জীবিত হন এবং সেই জড়দেহ আবার তাঁকে ধারণ করে ফেলে যা তাঁকে চিরস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখবে। এর কবল থেকে কখনো তিনি মুক্তি পাবেন না। এখন লক্ষ্য করুন, কোন সৎপ্রকৃতির লোক কি এ বিশ্বাসটিকে গ্রহণ করতে পারে? কোন পবিত্র বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি কি এর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে? প্রাকৃতিক নিয়মের কোন এক কণা পরিমাণও কি নিরঞ্জন ও অপরিবর্তনীয় খোদার ক্ষেত্রে এমন অঘটন ও বিপদ আপদকে বিধেয় বলে সাব্যস্ত করতে পারে যে এক একটি জগতকে সৃষ্টি করতে ও তাদের পরিত্রাণ দিতে তাঁকে সর্বদা এক বার করে আবশ্যকীয়ভাবে মরতে হয়? আত্মহত্যা ছাড়া তিনি তাঁর কল্যাণ বিতরণের কোন গুণ প্রকাশ করতে পারেন না এবং ইহকালে কি পরকালে কখনো তাঁর সৃষ্টজীবকে কোন সুখ দিতে পারেন না? এটা সুস্পষ্ট যে বান্দাদের প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণের উদ্দেশ্যে যখন তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় তখন এতে সাব্যস্ত হয়, আবশ্যকীয়ভাবে সর্বদা তাঁর মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং আগেও অসংখ্যবার তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকবেন। আর এ কারণে হিন্দুদের

পরমেশ্বরের ন্যায় তাঁর গুণাবলী রহিত হওয়াও সাব্যস্ত হয়। এখন নিজেরাই ভেবে দেখুন, এমন অসহায় ও অক্ষম সত্তা কি খোদা হতে পারেন যিনি আত্মহত্যা ছাড়া তার সৃষ্টজীবকে কখনো এবং কোন যুগেই কোন উপকার করতে পারেন না? দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের এহেন অবস্থা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষেত্রে শোভনীয় হতে পারে? অতঃপর দেখুন খ্রিষ্টানদের খোদার মৃত্যুর কী পরিণতি এবং ফলাফল শূন্য। তাদের খোদার প্রাণ গেল কিন্তু শয়তানের অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়া-কলাপের চুল পরিমাণও নড়চড় হলো না। সেই শয়তান এবং তার চেলা চামুন্ডা যেমন পূর্বে ছিল এখনো তেমনই রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যাচার, মদ্যপান✡, জুয়া, পার্থিব

✡- সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়, বৃটিশ রাষ্ট্রে প্রতি বছর তের কোটি ষাট হাজার পাউন্ড অর্থ মদ তৈরী ও মদ্যপানে ব্যয় করা হয় (এবং একজন সাংবাদিক এম. এ.-এর প্রতিবেদনে প্রকাশ যে) মদ্যপানের কারণে লন্ডনে শত শত আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। শুধু লন্ডন নগরীতে বসবাসকারী ত্রিশ লাখের মাঝে সম্ভবত (মাত্র) দশ হাজার লোক হবে যারা মদখোর নয়। নচেৎ নারী পুরুষ সবাই সোৎসাহে স্বাধীনভাবে মদ খায় এবং খাওয়ায়। লন্ডনবাসীদের এমন কোন সভা, অনুষ্ঠান ও সমাবেশ নেই যেখানে সবার আগে ব্রাণ্ডী, শৈরী তথা লাল মদিরা ইত্যাদি মদের বিশেষ আয়োজন করা হয় না। মদ্যপানকে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তদুপরি লন্ডনের বড় বড় পাদ্রী ও প্রধান ব্যক্তিবর্গও ধার্মিক বলে পরিচিত হয়েও মদ্যপানে প্রথম সারিতে থাকেন। মি. নিকলেট সাহেবের বদৌলতে যতগুলো অনুষ্ঠানে আমার যোগদানের সুযোগ ঘটেছে সেসব গুলোতেই অবশ্যই দু চারজন যুবক পাদ্রী এবং রেভারেন্ডকেও যোগদান করতে দেখেছি। লন্ডনে মদ্যপানকে কোন দোষের বলে গণ্য করা হয় না এবং এতো প্রকাশ্যে মদ্যপান প্রচলিত যে আমি লন্ডনে ভ্রমণকালে নিজ চোখে অধিকাংশ ইংরেজকে পথে পথে মদের বোতল হাতে উম্মত্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। তেমনি লন্ডনের সড়কগুলোতে হাতে মদের বোতল ধরা মাতাল অবস্থায় নারীদেরকেও দেখা যায়। রীতিমত ভালো বহু ভদ্র লোককে বাজারে নর্দমা গুলোতেও মদমত্ততায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকতেও দেখা যায়। মদ্য পানের বদৌলতে লন্ডনে এত বেশি সংখ্যক আত্মহত্যা সংঘটিত হতে থাকে যে প্রত্যেক বছর এর এক মহামারি লেগে যায় (রাহবারে হিন্দ লাহোর, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ)।

মোহ গ্রস্ততা, বেঈমানী, অবিশ্বাস, শেরক, কুফরী, নাস্তিকতা এবং অন্যান্য শত শত অপরাধ মসীহর ক্রুশবিদ্ধ হবার পূর্বে যেমন ছিল তেমনি জোরে শোরে এখনো আছে বরং অনেকগুণ বেশি। যেমন লক্ষ্য করুন, খ্রিষ্টানদের খোদা যখন জীবিত ছিলেন সেই যুগে খ্রিষ্টানদের অবস্থা ভাল ছিল তখনই কিনা সেই খোদার মৃত্যু ঘটলো যা প্রায়শ্চিত্ত বলে অভিহিত। আর তখন থেকেই বিস্ময়করভাবে শয়তান এই জাতির ওপর চেপে বসলো এবং পাপাচার, অবাধ্যতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র দুয়ার খুলে গেলো। সুতরাং খ্রিষ্টানগণ নিজেরাই স্বীকার করেন। যেমন 'মিযানুল হক' পুস্তকের প্রণেতা পাদ্রী ফেন্ডল বলেন, খ্রিষ্টানদের পাপাধিক্য, তাদের অভ্যন্তরীণ দুরাচার, অবাধ্যতা ও দুষ্কর্ম ছড়িয়ে পড়ার কারণেই মুহাম্মদ (সা.) খ্রিষ্টানদের সতর্ককরণ ও শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব এসব বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে, বেশির ভাগ অবাধ্যতা ও পাপাচারের ঝড় মসীহর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার পরেই খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রবাহিত হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, মসীহর মৃত্যু এতোদ্দেশ্যে ছিল না যে এতে পাপের তীব্রতায় কিছু ঘাটতি

তেমনিভাবে এক ভদ্রলোক লণ্ডনে সাধারণভাবে সংঘটিত ব্যভিচার এবং (এর ফলে) প্রতি বছর প্রায় সত্তর হাজার সংখ্যায় অবৈধ সন্তান জন্মলাভের কথা উল্লেখ করে এসব লোকের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার অনুল্লেখযোগ্য বিবরণ লিখেছেন। আরও লিখেছেন যে, ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর সভ্য ও শিক্ষিত লোকদের যদি দশ ভাগে বিভক্ত করা হয় তাহলে এদের নয় ভাগ লোকই নাস্তিক। যারা ধর্মের গণ্ডিমুক্ত। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও বিচারদিবসে বিশ্বাসকে তারা বিদায় দিয়ে বসেছে। নাস্তিকতার এ ব্যাধি ইউরোপে দৈনন্দিন বেড়ে চলেছে। আর মনে হয়, বৃটিশ সরকারের উদারনীতি এর প্রতি কোন ঘৃণা পোষণ করে না। অবশেষে কতিপয় কট্টর নাস্তিক পার্লামেন্টে সমাসীন হয়েছে এবং এজন্য কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। পর পুরুষদের যুবতী মেয়েদের চুম্বন খাওয়া শুধু বৈধই নয় বরং ইউরোপের নতুন সভ্যতার একটি শোভনীয় বিষয় বলে স্বীকৃত। কেউ দাবির সাথে বলতে পারে না যে ইংল্যান্ডে এমন কোন নারীও আছেন যাকে তার ভর যৌবনে কোন পরপুরুষ চুম্বন দেয়নি। আর ওয়েপ আলেকজেন্ডার সাহেব (আমার নামে) এক পত্রে লিখেছেন, সংসারলিপ্ততা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে এ দেশের সে সব লোক যারা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত তাদের মাঝে আমার দৃষ্টিতে এমন একজনও নেই, আখেরাতের প্রতি যার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। বরং তাদের সবাইকে আপাদমস্তক সংসার

সূচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মানুষ প্রচুর মদপান বা অনেক ব্যভিচার করে থাকলেও এবং সংসারলিপ্ত হলেও মসীহর (ক্রুশীয়) মৃত্যু ঘটার পর সেই সব রকম পাপ দূর হয়ে যাবে। কেননা এ বিষয়টি আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আজ মদ্যপান, জাগতিক মোহগ্রস্ততা, ব্যভিচার ও অশ্লীলতা বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোতে যে মাত্রায় এসে দাঁড়িয়েছে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো ভাবতে পারেন না যে মসীহর (ক্রুশীয়) মৃত্যুর পূর্বে পাপাচার ও দুষ্কর্মের ঝড় সে হারেই প্রবাহিত ছিল। বরং এর সহস্রতম অংশও প্রমাণ করা যাবে না। ইঞ্জিলগুলোতে গভীর দৃষ্টিপাতে সর্বতোভাবে এ সত্যটি বেরিয়ে আসে যে ইহুদীদের হাতে তিনি ধরা পড়ুন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে নিহত হোন মসীহ্ তা কখনো চান নি। কেননা তা-ই যদি তাঁর কাঙ্খিত হতো তাহলে সারা রাত কেন তিনি সেই বিপদটা দূর করে দিতে কাঁদতে থাকেন? কেন তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন হে পিতা, তোমার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব, এ পাত্রটি আমা থেকে টলিয়ে দাও। বরং এটাই সত্য যে,

পূজায় মত্ত বলে দেখা যায়। এখন এসব বর্ননায় স্পষ্ট হয় যে, মসীহর (কথিত) আত্মদানের যেসব সুপ্রভাব পাদ্রী মহোদয়েরা হিন্দুস্তানে গিয়ে সরলচেতা লোকদের শুনিয়ে থাকেন তা সর্বৈব পাদ্রীসাহেবদের বানানো মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব সত্য এটাই যে, প্রায়শ্চিত্তের শিক্ষা গ্রহণ করে খ্রিষ্টানদের মনমানসিকতা যেদিকে ধাবিত হয়েছে তা এটাই যে মদ্যপান বৃদ্ধি পেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যভিচার এবং লম্পট পন্থাকে বৈধ বলে গন্য করা হয়েছে এবং জুয়া লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ছে। খোদা তাআলার সেই খাঁটি উপাসনা যা সত্যনিষ্ঠ হয়ে পালন করা হয় এ জাতীয় সব বিষয় উধাও এবং রহিত হয়ে পড়েছে। তবে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক নিয়ম-শৃঙ্খলাপূর্ণ সভ্যতা ইউরোপে অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ পারস্পরিক সামঞ্জোতা বিরুদ্ধ (তথা আওতাবহির্ভূত) যেসব অপরাধ ও অপকর্ম রয়েছে যেমন চুরি, হত্যা ও জোরপূর্বক ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি যা রাষ্ট্রীয় আইনে দেশের জনকল্যাণের প্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এসব পাপাচারের প্রতিরোধ ও প্রতিকার এ কারণবশত নয় যে মসীহ্র প্রায়শ্চিত্ত এতে কোন প্রভাব ফেলেছে। বরং আইন-কানুনের ভয় এবং সামাজিক চাপেরই প্রভাব রয়েছে। উল্লেখিত বাধানিষেধ না থাকলে খ্রিষ্টান মহোদয়গণ অবাধে সবকিছুই করে বেড়াতেন। তথাপি এসব অপরাধই অন্যান্য দেশের মত ইউরোপেও সংঘটিত হতে থাকে। সার্বিক প্রতিকার হয় এমনতো বলা যায় না।

মসীহ্ অনিচ্ছায় ঘটনাচক্রে ধরা পড়েন এবং তিনি মৃত্যু ঘটার সময় পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে এ দোয়াই করেন – হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি আমাকে কেন ছেড়ে দিলে?

এতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় মসীহ্ জীবিত থাকতে চেয়েছিলেন। দুনিয়াতে আরও কিছু দিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে ছটফট করছিল, যেন কোন উপায়ে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি এই সফরের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর এক্ষেত্রে এও চিন্তা করার বিষয় যে খ্রিষ্টানদের সাব্যস্তকৃত ধারায় জাতির খাতিরে মারা যাওয়ায় মসীহর কি-ই বা লাভ হয়েছিল এবং এতে জাতিরই বা কী উপকার সাধিত হয়েছিল? বরং তিনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জাতির মাঝে অনেক রকম সংশোধনমূলক কাজ করতে পারতেন। বড় বড় দোষ তাদের থেকে দূর করে দেখাতেন। কিন্তু তাঁর এই অকাল মৃত্যুর কারণে শত শত ফেৎনা ও সমস্যার সৃষ্টি হলো এবং এমন সব খারাপির উদ্ভব হলো। তাঁর মৃত্যু এ ছাড়া আর কী-ই বা সাধন করে দেখাল? যার কারণে এক জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলো। এটা সত্য যে সাহসী লোকেরা জাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গও করে থাকেন অথবা জাতির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেকে ধ্বংসও করে ফেলেন। কিন্তু সেই বৃথা ও অহেতুক ধারায় নয় যা মসীহর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। বরং যে ব্যক্তি বিজ্ঞোচিতভাবে প্রাণ বিসর্জন করেন বা ধ্বংসের মুখোমুখি হন তিনি অবশ্যই আত্মোৎসর্গের জন্য ন্যায়সঙ্গত, পছন্দনীয় ও কল্যাণজনক এবং প্রকাশ্য জনহিতকর কোন উত্তম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এতে তিনি কষ্টের শিকার হোন অথবা নিহতই হোন না কেন তথাপি তার জাতি বিপদাবলী থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তবে এমনটি তো হওয়া উচিত নয় যে, তিনি ফাঁস নিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে বা কোন কুয়োয় পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করবেন আর মনে করবেন তার আত্মহত্যা জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হবে। এ রকম করাটা তো পাগলদের কাজ। বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণদের কাজ হতে পারে না। বরং এ ধরনের মৃত্যু হারাম ও অপমৃত্যু হয়ে থাকে। কোন নিতান্ত অজ্ঞ বা অতি সরল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ রকম ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। আমি সত্য সত্য বলছি, অনেক মানুষের রক্ষার জন্য কোন দৃঢ় সংকল্পশালী সিদ্ধপুরুষের মৃত্যু কোন ন্যায়সঙ্গত ও সুখ্যাত পদ্ধতিতেই

ঘটুক না কেন তবুও তা শুভ নয়। বরং তা বিপদের এবং শোকের কারণ। আর সেই ব্যক্তি যার মাধ্যমে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হতে থাকে তিনি যদি আত্মহত্যার জন্য মনস্থ করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ তাআলার এক মহাপাপী এবং তাঁর পাপ এ রকম অন্যান্য অপরাধীর চেয়েও অনেক কঠিন। অতএব এ শ্রেণীর প্রত্যেক সিদ্ধপুরুষের পক্ষে আবশ্যকীয়ভাবে নিজের জন্য খোদা তাআলার দরবারে দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করা উচিত। যাতে তিনি মানুষের কল্যাণার্থে সেইসব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন যার উদ্দীপনা তাঁর হৃদয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে দুষ্কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মারা যাওয়া তার জন্য শ্রেয়, যাতে তার দুষ্কর্মের পরিধি বাড়তে না থাকে এবং মানুষ তার নিত্যকার ফেৎনার দরুন ধ্বংস না হয়।

আর যদি প্রশ্ন করা হয়, মানবজাতির সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ঐশী প্রতাপ প্রকাশার্থে সঙ্গত পন্থায় ও জরুরী অবস্থায় সব নবী-রসূলের মাঝে কোন্ নবী নিজেকে অধিকতর ধ্বংসের কবলে ফেলেছেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হতে চেয়েছেন? হযরত মসীহ্ বা অন্য কোন নবী, না কি আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)? তাহলে জেনে রাখুন এ প্রশ্নের উত্তর এক অসাধারণ আবেগ, উদ্দীপনা, অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আমার হৃদয়ে বিদ্যমান। এটি অনেক দীর্ঘ কলেবর সাপেক্ষ। তাই আমি আক্ষেপের সাথে তা এখানে লিপিবদ্ধ করতে বিরত রয়েছি। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তা বহনে অপারগ। ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর (সর্ব সক্ষম আল্লাহ চাইলে) যদি আয়ু সহায়তা করে তাহলে আগামীতে এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্টভাবে আলাদা এক পুস্তক প্রণয়ন করবো। তবে আমি অতি সংক্ষেপে এখানে সুসংবাদ দিচ্ছি, সেই পূর্ণ মানব যিনি সমগ্র মানবকুলের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গকারী তিনি হলেন আমাদের নবী করীম অর্থাৎ সৈয়্যদনা ও মাওলানা, ওহীদুনা ও ফারীদুনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ উল মুস্তাফা আর রাসূলুন নাবীউল উম্মীউল আরাবীউল কার্শী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (অর্থাৎ আমাদের মনিব, অবিভাবক, আমাদের প্রিয় ও অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা, রসূল ও নবী উম্মী কুরায়শী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ।

এস্থলে আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান সত্য ও মিথ্যা ধর্মের পার্থক্য নির্ণয়কারী বিষয়সমূহ অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে বিচার নিষ্পত্তি হতে পারে সেগুলোর কিছু লিখে দিয়েছি। কিন্তু স্বর্গীয় নিদর্শনের মাধ্যমে যে পার্থক্য প্রকাশিত হয় তাও এতটাই জরুরী যে তা ব্যতিরেকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য করা যায় না। আর তা হলো, সত্যধর্মের অনুসারীর সাথে খোদা তাআলার এক বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পরিপূর্ণ অনুসারী ব্যক্তি তার অনুকরণীয় নবীর বিকাশস্থল হয়ে যায়। তাঁর আধ্যাত্মিক গুণ ও অবস্থাবলীর এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও আশিসের এক দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। আর পুত্রের মধ্যস্থতায় পৌত্রও যেমন পুত্র হিসেবে গণ্য হয় তেমনি যে-ব্যক্তি নবীর অনুবর্তিতার ছত্রছায়ায় লালিত পালিত হয় তার সাথেও সে একই কৃপা ও অনুগ্রহ সুলভ আচরণ হয়ে থাকে যেমনটি নবীর সাথে হয়ে থাকে। নবীকে যেমন ঐশী নিদর্শনাবলী দেখানো হয় তেমনি বিশেষভাবে তার তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকেও নিদর্শনাবলী দান করা হয়। অতএব এ রকম লোক সেই ধর্মের সত্যতার স্বপক্ষে এক জীবন্ত নিদর্শন হয়ে থাকেন যে ধর্মের সহায়তার উদ্দেশ্যে তাদের আবির্ভাব ঘটে থাকে। খোদা তাআলা স্বর্গীয়ভাবে তাঁদের সাহায্য ও সমর্থন করে থাকেন এবং অধিকহারে তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং কবুলিয়ত সম্পর্কে অবহিতও করেন। তাদের ওপর বিপদাবলীও অবতীর্ণ হয়। তবে সেগুলো তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাদের সমর্থনে অবশেষে ঐশী ক্ষমতা প্রকাশক নিদর্শন অবতীর্ণ হয়। তাঁরা (তাঁর পথে) অপমানিত হওয়ার পর পুনরায় সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন এবং এক মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে যান যাতে খোদা তাআলার বিশেষ ক্রিয়াসমূহ তাঁদের মাঝে প্রকাশিত হয়।

এ প্রসঙ্গে এ তত্ত্বটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে দোয়া দু'ভাবে কবুল হয়ে থাকে: (১) পরীক্ষামূলকভাবে (২) মনোনয়নমূলকভাবে। পরীক্ষামূলকভাবে তো কখনো কখনো পাপাচারী ও অবাধ্যদের বরং কাফেরদের দোয়াও কবুল হয়ে যায়। কিন্তু এটি নির্ঘাৎভাবে প্রকৃত কবুলিয়তকে বোঝায় না। বরং আকস্মিক ও পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু মনোনয়নমূলকভাবে দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সে দোয়া প্রার্থনাকারী আল্লাহ্ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন এবং ঐশী মনোনয়নের সার্বিক জ্যোতি ও লক্ষণ তাঁর মাঝে

প্রকাশিত হবে। কেননা খোদা তাআলা প্রকৃত কবুলিয়তরূপে অবাধ্যদের দোয়া কখনো গ্রহণ করেন না। বরং তাঁদেরই কথা শোনেন যারা তাঁর দৃষ্টিতে সত্যপরায়ণ এবং তাঁর হুকুম মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকেন। অতএব পরীক্ষামূলক এবং মনোনয়নমূলক দোয়াসমূহের কবুলিয়তের মাঝে পার্থক্য হলো, পরীক্ষামূলকভাবে দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে মুত্তাকী ও খোদাপ্রিয় হওয়ার শর্ত নেই এবং এও জরুরী নয় যে খোদা তাআলা দোয়া কবুল করে তাঁর বিশেষ কথপোকথনের মাধ্যমে এর গৃহীত হওয়ার সংবাদও দান করবেন। সেসব দোয়া এমন উঁচু পর্যায়েরও হয় না যা কবুল হওয়ায় তা কোন বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপার বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু যেসব দোয়া মনোনয়নমূলক হওয়ার কারণে কবুল হয় সেগুলোতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নাবলী সুস্পষ্ট হয়ে থাকে:

প্রথমত, প্রর্থনাকারী একজন মুত্তাকী, সত্যপরায়ণ ও সিদ্ধপুরুষ হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, সে দোয়ার কবুল হওয়ার সম্পর্কে ঐশী বাণীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করা হয়।

তৃতীয়ত, গৃহীত এমন অধিকাংশ দোয়া অতি উঁচু স্তরের এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পর্কিত হয়ে থাকে। এগুলোর কবুল হওয়ার মাধ্যমে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এটা মানুষের কাজ ও মানবীয় চেষ্টা কৌশল নয়, বরং খোদা তাআলার কুদরতের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত যা বিশেষ বান্দাদের স্বপক্ষে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

চতুর্থত, পরীক্ষামূলক দোয়াসমূহ কখনো কখনো বিরলভাবে কবুল হয়ে থাকে। কিন্তু মনোনয়নমূলক দোয়া বিপুল ধারায় কবুল হয়ে থাকে। অনেক সময় মনোনয়নমূলক দোয়ার মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি এমনসব গুরুতর সংকটে আটকে যান যে অন্য কেউ সেগুলোতে জড়িয়ে পড়লে সে আত্মহত্যা ছাড়া উপায়ন্তর খুঁজে পেতো না। সুতরাং এমনটিই বাস্তবে ঘটেও থাকে। যেমন, খোদা থেকে দূর সংসারাসক্ত লোকেরা যখন কখনো বড় বড় কোন দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, রোগ-ব্যাধি ও অসমাধানযোগ্য বিপদাপদে পড়ে যায়, তখন তারা ঈমানের দুর্বলতাবশত খোদা তাআলার প্রতি নিরাশ হয়ে যেকোন ধরনের

বিষ খেয়ে ফেলে অথবা কুয়োয় ঝাঁপ দেয় কিংবা বন্দুক ইত্যাদির দ্বারা আত্মহত্যা করে। কিন্তু এরূপ সংকটময় মূহুর্তে মনোনয়নের মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের ঈমানী শক্তি এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে অতি বিস্ময়কর ধরণের সাহায্য সহায়তা লাভ করেন এবং ঐশী কৃপা এক আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে রক্ষা করে থাকে। তা দেখে অবশেষে অভিজ্ঞ যেকোন ব্যক্তির হৃদয় সায় দিয়ে ওঠে যে তিনি একজন ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত (মহাপুরুষ)।

পঞ্চমত, মনোনয়নযোগ্য দোয়া কবুলের মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষভাবে ঐশী অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে যান। খোদা তাআলা তাঁর সব কাজে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকেন এবং ঐশী প্রেমের জ্যোতি, ঐশীগ্রহণযোগ্যতার মহিমায় বিভোরতা, আধ্যাত্মিক আস্বাদন ও ঐশীপ্রাচুর্য উপভোগের লক্ষণাবলী তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۚ (আল্ মুতাফ্ফিফীন 83 : 25)

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (ইউনুস 10 : 63-65)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝ (হামীম সিজ্দা 41 : 31-32)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ ✡ (আল্ বাকারা 2: 187)

✡ – *সাবধান, অর্থাৎ অবশ্যই জানবে, যারা আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তাআলাকে সত্যিকারভাবে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে ভালবাসেন*

এখন জানা উচিত, খোদার প্রিয়, গৃহীত ও মনোনীত এবং সত্যিকার বন্ধু হওয়ার মর্যাদা যার চিহ্নাবলী সংক্ষিপ্তাকারে আমি বর্ণনা করে এসেছি এ মর্যাদা আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুবর্তিতা ছাড়া কখনো অর্জিত হতে পারে না। তাঁর খাঁটি অনুসারীর মোকাবেলায় যদি কোন খ্রিষ্টান আর্য বা ইহুদী ঐশী গ্রহণযোগ্যতার জ্যোতি ও চিহ্নাবলী দেখাতে চায় তাহলে তার পক্ষে এমনটি করা কখনো সম্ভব হবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট পন্থা এই যে, একজন খাঁটি মুসলমান যিনি সত্যিকারভাবে নবী (সা.)-এর অনুবর্তিতাকারী এমন প্রকৃত মুসলমানের মোকাবেলায় অন্য কোন ব্যক্তি যেমন খ্রিষ্টান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে যদি ঘোষণা করে, 'তোমার স্বপক্ষে যে পরিমাণ ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে অথবা যে পরিমাণ গোপন রহস্যের বিষয় তোমার কাছে উন্মোচিত হবে,

---

তাদের চিহ্ন হচ্ছে, কী খাবে, পান করবে বা অমুক বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে এ রকম কোন ভয়ভীতি তাদের কখনো পেয়ে বসে না। কেননা তাদের স্বস্তিদান করা হয়, আশ্বস্ত করা হয় এবং বিগত কোন কিছুর জন্য তাদের কোন দুঃখ-বেদনায় পড়তে হয় না। কেননা তাদের ধৈর্য দান করা হয়। দ্বিতীয় চিহ্ন হলো, তারা ঈমান রাখে অর্থাৎ ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ ঈমান ও আজ্ঞানুবর্তিতা বিরুদ্ধ সব বিষয়াদি থেকে অনেক দূরে থাকে। তাদের তৃতীয় চিহ্ন হলো, ইহকালেও এবং পরকালেও তারা (ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে) সুসংবাদ পেতে থাকে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এটি এক অলঙ্ঘনীয় অঙ্গীকার এবং অতি প্রিয় এ মর্যাদাতেই তারা ভূষিত অর্থাৎ খোদা তাআলার যেসব বিশিষ্ট বান্দা তাঁর ওলী হয়ে থাকেন তারা অবশ্যই ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্ন থেকে অংশ পেয়ে থাকেন। ঐশীবাণীর দ্বারা ভূষিত হওয়াই তাদের ওলীত্বের প্রধান পরিচিতি। (এটাই আল্লাহ্ তাআলার কুদরত প্রকাশক নিয়মনীতি)। যারা অন্যান্য সব (কৃত্রিম) প্রভু-প্রতিপালকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলাকেই নিজ প্রভু-প্রতিপালকরূপে বেছে নেয় তারা বলে, 'আল্লাহ্ তাআলা আমাদের একমাত্র প্রভু-প্রতিপালক' (অর্থাৎ অন্য কারও প্রতিপালনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নেই)। এরপর তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার মুহূর্তগুলোতে অনড় অটল থাকে। (যত কঠিন আলোড়নকারী বিপদ ও ঝড়-ঝাপটা আসুক এবং অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ুক না কেন তাদের ভেতর একটুও নড়চড়, পরিবর্তন ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয় না বরং তারা পুরোপুরি (ইস্তেকামতে) অবিচল থাকেন)। তখন তাদের ওপর

অথবা দোয়া কবুলের মাধ্যমে তোমাকে যা যা সাহায্য দান করা হবে, অথবা তোমার সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য যেভাবে ঐশী ক্ষমতার কোন দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হবে, অথবা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে তোমাকে যেসব বিশেষ পুরস্কারে

ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয় (অর্থাৎ ঐশীবাণী ও সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে তারা সুসংবাদ পেতে থাকে): 'ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু অবিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক বটে এবং পরকালে তোমাদের মন যা কিছু আকাঙ্খা করবে তা সবই তোমরা পাবে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যদি কিছু অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের তারা সম্মুখীন হয়েও থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা পরকালে সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাবে এবং সব মনষ্কামনা পূর্ণ হবে। যদি কেউ বলেন, এটা কী করে হতে পারে যে পরকালে মানুষের মন যা চাইবে তা সে পাবে? আমি বলছি, এমনটি ঘটা একান্ত আবশ্যকীয়। এমনটি হওয়ার নামই নাজাত (পরিত্রাণ)। নচেৎ মানুষ নাজাত লাভের পর যদি কিছু কিছু বিষয় কামনা করতে থাকে আর সেগুলোর জন্য তার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হতে থাকে এবং অন্তর্জালায় জ্বলতে থাকে তবুও তার সেসব আশা-আকাঙ্খা যদি পূরণ না হয় তা হলে এ আবার কিসের নাজাত হলো? এতে বরং এক ধরনের আযাব থেকেই গেল। অতএব জান্নাত, বেহেশ্‌ত বা 'মুক্তিখানা' বা স্বর্গ যে নামেই এ মার্গটি অভিহিত হোক প্রকৃতপক্ষে এই পরম সৌভাগ্যলাভের গৃহটি আবশ্যকীয়ভাবে এমন হওয়া চাই যেখানে মানুষের সর্বত স্বচ্ছ ও নির্মল সুখ ও আনন্দ লাভ হবে, যেখানে ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে কোন দুঃখ ও বেদনাদায়ক বিষয় থাকবে না। কোন ব্যর্থতা ও বিফলতার জ্বলন হৃদয়ে প্রভাব ফেলবে না। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে বেহেশতে অশোভনীয় কোন বিষয় বা কার্যকলাপ হবে না এবং পবিত্র হৃদয়ে অশুভ আকাঙ্খাও সৃষ্টি হবে না। বরং শয়তানী ধ্যান-ধারণামুক্ত এ সব পাক-পবিত্র হৃদয়ে মানবীয় সৎস্বভাব ও সচ্চেতনা এবং স্রষ্টার পবিত্র ইচ্ছা মাফিক পবিত্র আকাঙ্খার উদ্ভব হবে, যাতে মানুষ তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এবং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৌভাগ্যকে পুরোপুরি অর্জন করতে পারে। আর যাতে নিজ যাবতীয় স্বভাবজ ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানব বলে অভিহিত হতে পারে। কেননা বেহেশতে প্রবেশ লাভ মানবপ্রকৃতির বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে নয় যেমন কিনা আমাদের বিরোধী খ্রিষ্টান ও আর্যগণ মনে করেন। বরং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মানবপ্রকৃতির অবয়ব যেন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে পূর্ণাকারে বিকশিত হয় এবং সব রকম অসঙ্গতি দূর হয়ে যথাযথ সেই সব বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে যা পূর্ণ মানবের জন্য তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সজ্জনের দিক দিয়ে আবশ্যকীয়।

ভূষিত করার প্রতিশ্রুতি দান করা হবে অথবা তোমার কোন ক্ষতিসাধনকারী ঘোর বিরোধীর সম্পর্কে যে কোন সতর্কীকরণমূলক সংবাদ দান করা হবে উল্লেখিত সব বিষয়ে যা কিছু তোমার পক্ষ থেকে বাস্তবে প্রকাশিত হবে এবং এতদসম্পর্কীয় যা কিছু তুমি দেখাবে তা আমিও দেখাবো' তাহলে (নিশ্চিত জানবেন) কোন বিরুদ্ধবাদীর পক্ষেই এরূপ প্রতিদ্বন্দিতা করা কখনো সম্ভব হবে না এবং তারা কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে না। কেননা তাদের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তারা মিথ্যেবাদী। সেই প্রকৃত ও সত্য খোদার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই যিনি সত্যপরায়ণদের সাহায্যকারী এবং সিদ্দীকগণের বিশ্বস্ত বন্ধু রয়েছেন যেমন পূর্বেও আমি এ সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা করে এসেছি।

وَهَـذَا اٰخِرُ كَلَا مِنَا وَالْحَمْدُلِلّٰهِ اَوَّلًا وَّ اٰخِرًا وَّ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا۔

هُوَمَوْلَانَا نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ الْوَكِيْل

(অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে এবং যাহেরে ও বাতেনে সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনিই আমাদের প্রভু ও অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম কার্য নির্বাহক!- অনুবাদক)।

এরপর আল্লাহ বলেন, আমার বিশেষ বান্দারা (যারা মনোনীত) আমার সম্পর্কে যখন জিজ্ঞেস করে আমি কোথায়? তখন তাদের জানা উচিত যে আমি অতি নিকটে রয়েছি। আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের দোয়া আমি শুনি যখনই কোন নিষ্ঠাবান বান্দা দোয়া করে (তা মনে মনেই করুক বা মুখে করুক) আমি তা শুনে থাকি (অতএব এতে করে নৈকট্য স্পষ্ট)। কিন্তু তাদের উচিত তারা যেন সেই রকম অবস্থা তৈরী করে সেটি বজায় রাখে, যে অবস্থার দরুন তাদের দোয়া আমি শুনতে পারি। অর্থাৎ মানুষ নিজের অন্তরায় নিজেই হয়ে যায়। যখন পবিত্র অবস্থা পরিত্যাগ করে দূরে সরে যায় তখন খোদা তাআলাও তার কাছ থেকে দূরে চলে যান। আর আমার প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় রাখা আবশ্যক (কেননা ঈমানী শক্তির আশির্বাদে দোয়া শীঘ্র গৃহীত হয়ে থাকে)। তারা যদি এমনটি করে তাহলে সাফল্য অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ খোদাতাআলা সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং ঐশী অনুগ্রহ ও পথপ্রদর্শন তাদের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, তাদের কখনও ছেড়ে যাবে না। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়াও আল্লাহ্‌র 'আওলিয়া' তথা বন্ধুদের স্বপক্ষে একটি বিরাট নিদর্শন বটে। 'ফা-তাদাব্ বার (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা আবশ্যক)–প্রণেতা।